২৪৪

সাক্ষরতা বুলেটিন

আশ্বিন ১৪২১
সেপ্টেম্বর ২০১৪

সাক্ষরতা বুলেটিন

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের
বেসরকারি ঐক্য প্রতিষ্ঠান
গণসাক্ষরতা অভিযান
থেকে প্রকাশিত

সংখ্যা ২৪৪ আশ্বিন ১৪২১ সেপ্টেম্বর ২০১৪

সাক্ষরতা বুলেটিন-এ
প্রকাশিত রচনাসমূহের
ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ,
মতামত সম্পূর্ণত
লেখকের,
গণসাক্ষরতা অভিযান
কর্তৃপক্ষের নয়।

সূচিপত্র

৩ ম. হাবিবুর রহমান
অধরা সাক্ষরতা ও টেকসই উন্নয়ন

৬ মো. মিজানুর রহমান
দূর-শিক্ষা ও স্বশিখন সামগ্রী

১২ শাওয়াল খান
আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস- লক্ষ্য সবার জন্য শিক্ষা

১৮ তপন কুমার দাশ
সাক্ষরতা ও টেকসই উন্নয়ন: সময়ের দাবি

২২ ড. খন্দকার নেছার আহমেদ
শিশু শিক্ষা কার্যক্রমে প্রাথমিক শিক্ষার ভূমিকা

২৪ মোহাম্মদ হারুন মিয়া
কিভাবে ভালো পাঠক হওয়া যায়

২৭ তথ্যকণিকা

২৯ সংবাদ

সৌজন্য:
ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

ম. হাবিবুর রহমান

অধরা সাক্ষরতা ও টেকসই উন্নয়ন

গত ৩১ আগস্ট একটি সাক্ষরতা কেন্দ্র দেখার জন্য রংপুর জেলার কাউনিয়া উপজেলার বল্লভবিষু গ্রামে গিয়েছিলাম। এই কেন্দ্রটি পরিচালনা করে স্থানীয় আরডিআরএস-এর শহীদবাগ ইউনিয়ন ফেডারেশন। সংসারের কাজকর্ম সেরে ১২ জন নারী আর দু'জন পুরুষ শহীদবাগ সাক্ষরতা কেন্দ্রে লেখাপড়া করতে এসেছেন। আমরা যখন শহীদবাগ সাক্ষরতা কেন্দ্রে পৌঁছলাম তখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা প্রায়। কিন্তু তখনও চোখে মুখে তাঁদের যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখেছি, তা সত্যিই আমাদের অভিভূত করেছে। সেই শেষ বিকেলে এদের মধ্যে প্রশ্ন করে ছিলাম, এ বয়সে লেখাপড়া শিখে কী হবে? উত্তরে রওশন আরা বললেন, কী হবে মানে? আমার কী বই পড়তে ইচ্ছে করে না? নিজে শিখে নাতি-নাতনিকে কী দু'চার কলম পড়ালেখা করাতে ইচ্ছে করে না? সত্যিই তো এই ইচ্ছেগুলো কী পূরণ হওয়ার নয়? এটা কী খুব বড় একটা চাওয়া।

রওশন আরার বয়স প্রায় পঞ্চাশের কোঠায়। অন্যদের বয়স হবে ৩৫ থেকে ৫৫। একজন তার সঙ্গে নাতিকে নিয়ে এসেছেন। সে দাদীর বই ধরে বসেছিল। আপনাদের পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে ছেলেটি কী করে, জিজ্ঞেস করলে দাদী আজিফা বেগম উত্তর দিলেন, ও বইগুলোর ছবি দেখে, তাতে ওর বইয়ের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। আর বছর খানেক পরে যখন ওকে স্কুলে পাঠাবো তখন হয়তো সে অনেকটাই তৈরি হয়ে যাবে। স্কুলে আগ্রহভরে যেতে চাইবে।

এ কেন্দ্রের সবাই কর্মজীবী নারী পুরুষ। মেয়েরা বাড়ির কাজের পাশাপাশি প্রয়োজনে শ্রম দেয়। মৌসুমভেদে তারা ১৫০ টাকা থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত মজুরি পায়। নাছিমা এ কেন্দ্রের শিক্ষিকা। তিনি বললেন, আমার মা-চাচিরা বাপ-চাচাদের চেয়ে সবসময়ই অন্তত ৫০ টাকা কম মজুরি পায়। কিন্তু তাতে তারা মন খারাপ করে না। মা-চাচিরা মনে করেন, কাজ করতে করতেই একদিন তারা ন্যায্য মজুরি পাবে। তারা মনে করেন, লেখাপড়ার পাশাপাশি অন্য কাজও করা খুবই জরুরি। সেসব কাজ সেলাই করা, ছাগলপালা, হাঁস-মুরগিপালা থেকে আলাদা হবে। আর সে জন্য প্রয়োজন নতুন জ্ঞানের, বিদ্যার। আর সেই বিদ্যাশিক্ষার জন্যই ওরা কাজের সঙ্গে লেখাপড়াটাকেও অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে মেনে ও মনে নিয়েছে।

এই যে সাক্ষরতা কেন্দ্রের বয়স্ক শিক্ষার্থীদের সাক্ষরতা শিক্ষার মাধ্যমে বেঁচে থাকা, অর্থবহ জীবনযাপন করা, যেমন নাতি-নাতনী, ভাই-বোন, পাড়া-পড়শিদের পড়ালেখা, গুণমানসম্মত জীবনযাপনে সহায়তা করার প্রচণ্ড ইচ্ছেকে কী আমরা সহায়তা করতে পারি না? যাদের সঙ্গতি, সামর্থ্য ও শক্তি আছে, তাদের কখনও কী অন্তরাত্মা তাঁদের বিবেককে দংশন করবে না?

বর্তমানে বাংলাদেশে অনক্ষরতার হার ৩৮.৪ শতাংশ। আর অর্ধ সাক্ষরতা হার ৮ শতাংশ। সম্প্রতি (২০১৩) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (ইইঝ) পরিচালিত 'লিটারেসি অ্যাসেসমেন্ট সার্ভে (Literacy Assessment Survey)' থেকে এ তথ্য জানা যায়। এ সার্ভেটি পরিচালিত হয়েছে ১১-৪৪ বয়ঃগোষ্ঠী জনমানুষের মধ্যে। এ সার্ভে থেকে আরো বলা যায় যে, বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ৫৩.৭ শতাংশ। বাংলাদেশে এখন গ্রামীণ অনক্ষরতার হার (৫২.৯%) যা শহুরে অনক্ষরতার হারের (৩৫.৭%) চেয়ে কম। এ থেকে সহজেই অনুমেয় যে, নারীদের অনক্ষরতার হার (৫২.১%) পুরুষদের অনক্ষরতার হারের (৪৫.৪%) চেয়ে কম। অন্যদিকে বিভাগীয় পর্যায়ে, অধিক অনক্ষর জনমানুষের বসবাস কিন্তু সিলেটে (৭০.১%)। আর কম অনক্ষরদের বসবাস হলো বরিশালে (৩২.২%)। বাংলাদেশে অনক্ষরতার এ হার হ্রাসে তিনটি উপ-শিক্ষা সেক্টর যেমন, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অব্যাহতভাবে অবদান রেখে যাচ্ছে। এর পরও সত্যি কথা হলো, আমরা আজও দেশের সকল অনক্ষর জনমানুষকে পূর্ণাঙ্গ সাক্ষরতা প্রদানে ব্যর্থ হয়েছি। ২০১৫ সালের প্রান্তে এসে আমরা এই দায় কাকে দেব? আসলে এই দায় কি আমাদের সবার নয়?

বর্তমান সরকার তাদের নির্বাচনী ইস্তেহারে, ২০১৪ সালে মধ্যে সবার জন্য সাক্ষরতা অর্জন করার অঙ্গীকার করে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজ পর্যন্ত এ সরকার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যতীত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাক্ষেত্রে অনক্ষরতা দূরীকরণের জন্য কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে পারেনি। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর বিগত ৫/৬ বছরে ৯/১০টি প্রকল্প প্রণয়ন করে। এগুলোর মধ্যে ৪/৫টি প্রকল্প বেশ বড় মাপের ও সময়োপযোগী ছিল। কিন্তু কোনো প্রকল্পই আলোর মুখ দেখেনি। এসব প্রকল্পের মধ্যে উল্লেখ করার মতো কয়েকটি হলো: ১. মৌলিক

সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প, ২. নগর দরিদ্র শিশুদের মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প; ৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম-কেন্দ্রিক শিক্ষা প্রকল্প; ৪. আবাসন জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষা প্রকল্প এবং ৫. সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্প।

নতুন কোনো প্রকল্প অনুমোদন করতে না পারলেও এ অধিদপ্তর পূর্বে অনুমোদিত দুটো প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এ দুটো প্রকল্প হলো– Post Literacy and Continuing Education for Human Development II (PLCEHD II) আর অন্যটি হলো Basic Education for Hard to Reach Urban Working Children (BEHTRUWC). PLCEHD যা শেষ হয়েছে ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে এবং ২০১৪ সালের জুনে।

সম্প্রতি সরকার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের 'মৌলিক শিক্ষা' নামে একটি নতুন প্রকল্প অনুমোদন করেছে। ৪ বছর মেয়াদি এই প্রকল্প ৬ মাসব্যাপী মৌলিক সাক্ষরতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। বহু গবেষণা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের মাঠ-অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে অব্যাহত শিক্ষা ব্যতীত শুধুমাত্র ছ'মাসের মৌলিক সাক্ষরতা মোটেও টেকসই হয় না। বরং তারা সাক্ষরতা শিক্ষা নেবার পরপরই নিরক্ষরে পর্যবসিত হয়। আমরা সকলে তা জানি, তা হলে সরকার কেন হঠাৎ করে এ জাতীয় কার্যক্রম হাতে নিলো?

বিগত বছরগুলোতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর নানা কারণে সরকারের নীতিনির্ধারক ও দাতাগোষ্ঠীর সহযোগিতা পেতে ব্যর্থ হয়েছে। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণ হলো; ১. রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও নীতিনির্ধারকদের মানস সংগঠনের ভিন্নতা, ২. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরে দীর্ঘদিন সঠিক নেতৃত্বের অভাব, ৩. পেশাজীবী বিশেষজ্ঞের অনুপস্থিতি ও সঠিক কুশলী অফিসার নিয়োগে ব্যর্থতা, ৪. ইআরডিসহ দাতা গোষ্ঠীর সহানুভূতি/সহায়তা অর্জনে অপারগতা, ৫. অধিদপ্তরের উপজেলা পর্যায়ের কাঠামোর অনুপস্থিতি এবং ৬. কার্যকরভাবে সুশীল সমাজের সহযোগিতা না পাওয়া।

সাক্ষরতা ভিন্ন টেকসই উন্নয়ন অসম্ভব। গত চল্লিশ বছরে, বিশেষ করে নব্বই এবং ২০০০-এর দশকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচিগুলো সফল টেকসই উন্নয়নেরই বার্তা দেয়। সাক্ষরতা যে টেকসই উন্নয়নের কার্যকরতার উপাদান; যেমন, সক্ষমতা (উচ্চ সামাজিক প্রতিদান), সমতা (ধনী মানুষের তুলনায় গরিব মানুষের ক্রয় ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত বেড়েছে) এবং বংশ পরম্পরায় পুনঃবণ্টন (জনসংখ্যা হ্রাসের ফলে শিশুদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অগ্রগতি হয়েছে) আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন ধরনের প্রায়োগিক গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা গেছে যে, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং শিক্ষা মানবসম্পদ উন্নয়নের মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্ক বিরাজমান। বাংলাদেশের স্কুলসমূহের প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যক্তিখাতে খরচের হার বেশ বেড়েছে। বাংলাদেশ হাউজহোল্ড এক্সপেনডিচার সার্ভের উপাত্ত থেকে জানা গেছে যে, আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যক্তিখাতে খরচের হার বেশ উল্লেখযোগ্য। যেসব শ্রমজীবী মানুষ প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেননি তাঁদের আনুমানিক প্রতিদানের হার ৩৭ শতাংশ, যাঁরা প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেছেন তাঁদের প্রতিদানের হার ৪৫ শতাংশ, আর যারা উচ্চ শিক্ষা নিয়েছেন তাঁদের প্রতিদানের হার ২২ শতাংশ।

ব্যক্তিক ও পারিবারিক কল্যাণের অগ্রগতিতে শিক্ষার বেশ দৃঢ় প্রভাব রয়েছে। বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলস সার্ভের তথ্য থেকে জানা যায় যে, বিভিন্ন নারীর অর্জিত শিক্ষার ওপর কল্যাণ নির্দেশকের বিভিন্নতা নির্ভর করে। এ জরিপে দেখা গেছে যে, নারী উচ্চ শিক্ষার যত শিখরে পৌঁছেছেন ততই স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণের স্কোর বেড়েছে। লেখাপড়া জানা নারীদের তুলনায় যেসব নারীর কোনো রকম শিক্ষা নেই তাদের গর্ভধারণের হার অনেক বেশি (৩.৯৩); আবার বিভিন্ন পর্যায়ের লেখাপড়া জানা নারীদেরও মাঝে গর্ভধারণ হারের বিভিন্নতা লক্ষ্যণীয়। যেসব নারীর ২/৩ বছরের লেখাপড়া আছে তাদের গর্ভধারণের হার ৩.২৭, যারা মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করেছে তাদের হার ৩.০ এবং যারা মাধ্যমিক বা তারও উপরের পর্যায়ে লেখাপড়া অর্জন করেছেন তাদের গর্ভধারণের হার ২.১। শিক্ষা গর্ভধারণ প্রক্রিয়াকে দেরি করিয়ে দেয়, বিশেষ করে ১৫-১৯ বছরের মেয়েদের মধ্যে।

বাবা-মার শিক্ষা, বিশেষ করে দুজনই যখন সাক্ষর, তা দৃঢ়ভাবে তাদের শিশুদের লেখাপড়া অর্জনকে প্রভাবিত করে। বাবা-মার শিক্ষা বংশপরম্পরায় প্রভাব রাখে, যেমন ছেলেমেয়েরা কতদূর পর্যন্ত পড়বে তা নির্ভর করে তার বাবা-মা কতদূর পর্যন্ত লেখাপড়া শিখেছেন। অন্য সমীক্ষায় দেখা গেছে, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হারে সামাজিক ও ভৌত মূলধন বৃদ্ধি পেয়েছে, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছে, প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে, বেড়েছে আইনী অধিকার, জাতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা। আর এগুলো সম্ভব হয়েছে সাক্ষরতা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের ফলে।

বাংলাদেশে পরিচালিত বিভিন্ন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের প্রাথমিক ফলাফলসমূহের নির্যাস হলো: ১. শিক্ষার সুফল সম্পর্কে জনগণের সচেনতা বৃদ্ধিতে সাক্ষরতা কার্যক্রম কার্যকর ভূমিকা রেখেছে; ২. সাক্ষরতা কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ শিক্ষার্থী অন্যদের সাক্ষরতা কেন্দ্রে যোগদানের জন্য পরামর্শ দিয়েছে; ৩. নারী অংশগ্রহণকারী তাদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে; ৪. উপানুষ্ঠানিক

শিক্ষার গ্রাজুয়েটরা সফলতার সঙ্গে সঞ্চয় ঋণ ও অন্যান্য আয় সৃজনী কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছে এবং ৫. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের হার বেড়েছে।

এত সব কিছুর পরও সরকারের নেতৃত্বে অনক্ষরতা দূরীকরণ কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। কারণ, এ দেশের সব অসাক্ষর জনমানুষ সাক্ষর না হলে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয় এবং নিজেদের মধ্য আয়ের দেশের সদস্য হিসেবে দেখতে ব্যর্থ হবো। সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হলে তার দায়ভার আমাদের সকলকেই বয়ে বেড়াতে হবে। সেজন্য আসুন, সবাই মিলে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের প্রাক্কালে নিচের পদক্ষেপ নিতে সরকারকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করি–

১. টেকসই সাক্ষরতার অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি পেতে হবে। আর তা বাস্তবায়নে সকল অংশীজনকে একত্রে কাজ করতে হবে।

২. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ফাউন্ডেশন-এ পরিণত করতে হবে। এই ফাউন্ডেশনের কাজ হবে মূলত তিনটি- দেশের বেসরকারি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা উদ্যোগকে আর্থিক সহায়তা প্রদান, দেশের বিভিন্ন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় ও যথাযথ পেশাজীবিতার সম্মিলন ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা দান এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা।

৩. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও উপানুষ্ঠানিক ফাউন্ডেশন-এর মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। আর ১১ বছর থেকে ৪৫ বছর বয়সী জনগোষ্ঠীর জন্য যে কোনো শিক্ষা উদ্যোগ; যেমন, মৌলিক শিক্ষা/সাক্ষরতা; সাক্ষরতা-উত্তর শিক্ষা, অব্যাহত শিক্ষার বৃত্তিমূলক ও কারিগরী প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য কার্যক্রম এবং জীবনভর শিখনের সকল উদ্যোগকে সহায়তা দেবে। সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের আদলে সরকার এই ফাউন্ডেশনকেও সব ধরনের সহায়তা দিয়ে যথাযথ সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেবে।

৪. পরীক্ষিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ এলাকা/ অঞ্চল/ জেলাভিত্তিক সাক্ষরতা কার্যক্রমের সমন্বয়নের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ফাউন্ডেশন-এর হয়ে দায়িত্ব পালন করবে এবং উদ্যোগী/ সহমর্মী পাবলিক ও প্রাইভেট উদ্যোগের সহায়তায় জীবনভর শিখনের কাঠামো গড়ে তুলবে।

৫. দাতাগোষ্ঠীর উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিষয়ে অগ্রাধিকার নির্ধারণে সরকারসহ অন্যান্য অংশীজনদের সঙ্গে একযোগে সপক্ষতা বা অ্যাডভোকেসি করবে। এ বিষয়ে গণসাক্ষরতা অভিযান কার্যকর ব্যবস্থা নিতে সরকারকে যথাযথ সহায়তা দিতে পারে।

৬. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ফাউন্ডেশন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক সমাপনী শিক্ষার আদলে মৌলিক সাক্ষরতা/ শিক্ষার কার্যক্রমগুলোকে মূলধারার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। এছাড়া TVET সেক্টরের জন্য ফাউন্ডেশন NTVEQL-এর আদলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সনাদায়নের ব্যবস্থা করবে।

৭. ফাউন্ডেশনসহ অন্যান্য বেসরকারি সংস্থা তাদের যে কোন মৌলিক শিক্ষা/ সাক্ষরতা কার্যক্রম নেওয়ার সময় দুর্গম এলাকাসমূহকে প্রাধান্য দেবে। গণসাক্ষরতা অভিযান এ জাতীয় কার্যক্রমের একটি মানচিত্রায়ন করার উদ্যোগ নিতে পারে।

৮. সরকার জাতীয় বাজেটে ১১ থেকে ৪৪ বছর বয়সী জনগোষ্ঠীর জন্য যথাযথ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ বরাদ্দ ও ব্যবহার নিশ্চিত করবে।

৯. ২০১৪ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা- সরকার ঘোষিত এই লক্ষ্যমাত্রা পুনর্নির্ধারণ করতে অত্যন্ত জরুরি।

১০. সাক্ষরতা কিংবা TVET সেক্টরে যে কোন নতুন প্রকল্পের উদ্যোগ নেবার সময় সংশ্লিষ্ট সকলকে সমন্বিতভাবে প্রকল্প প্রণয়নের বিষয়টি আন্তরিকভাবে বিবেচনা করতে হবে। একটি ভিন্ন অন্যটি দিয়ে কখনও কাঙ্ক্ষিত টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়।

পরিশেষে, সাক্ষরতার কার্যকারিতা জীবনব্যাপী। তাই জীবনভর শিখনের পরিকাঠামো নির্মাণ ভিন্ন সাক্ষরতার সম্প্রসারিত চিত্রকল্প বাস্তবায়ন অসম্ভব। সাক্ষরতা অনক্ষরতা দূরীকরণের কার্যকর বাহন হলেও তা কিন্তু সামষ্টিকভাবে একজন সাক্ষরমনস্ক সৃজনশীল মানুষ নির্মাণে সক্রিয় ভূমিকা রাখে। তাই একজন সাক্ষরমনস্ক সৃজনশীল মানুষ ধীরে ধীরে হলেও যোগাযোগ, জীবনরক্ষা, জীবননির্বাহী, সাংগঠনিক ও ক্ষমতায়নমুখী দক্ষতায় ঋদ্ধ হয়ে উঠবেন।

ম. হাবিবুর রহমান
উর্ধ্বতন উপদেষ্টা, শিক্ষা
সেভ দ্য চিলড্রেন

[আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০১৪ উপলক্ষে *আলোকিত বাংলাদেশ* পত্রিকায় ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪-এ প্রকাশিত।]

মো. মিজানুর রহমান

দূর-শিক্ষা ও স্বশিখন সামগ্রী

ভূমিকা

মুখোমুখি অর্থাৎ face-to-face (f2f) পদ্ধতির বাইরে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তা-ই মূলত দূর-শিক্ষা, যা বিশ্বব্যাপী Distance Education নামে অভিহিত। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় একটা নির্ধারিত শিক্ষাক্রম থাকে, আর এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে মুখোমুখি পাঠদান করেন। পরিশেষে, পরীক্ষা বা মূল্যায়নের মাধ্যমে বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীদের সনদ প্রদান করা হয়। এ কথা অনস্বীকার্য যে, 'শ্রেণিকক্ষ' শিক্ষার শক্তিশালী প্লাটফরম বা মঞ্চ। কিন্তু এ কথাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ যে, অনেক শিক্ষার্থীই নিয়মিত শ্রেণিকক্ষে হাজির হয়ে পাঠ গ্রহণ করতে পারে না। তাদের জন্য প্রয়োজন অন্য কোন ব্যবস্থা।

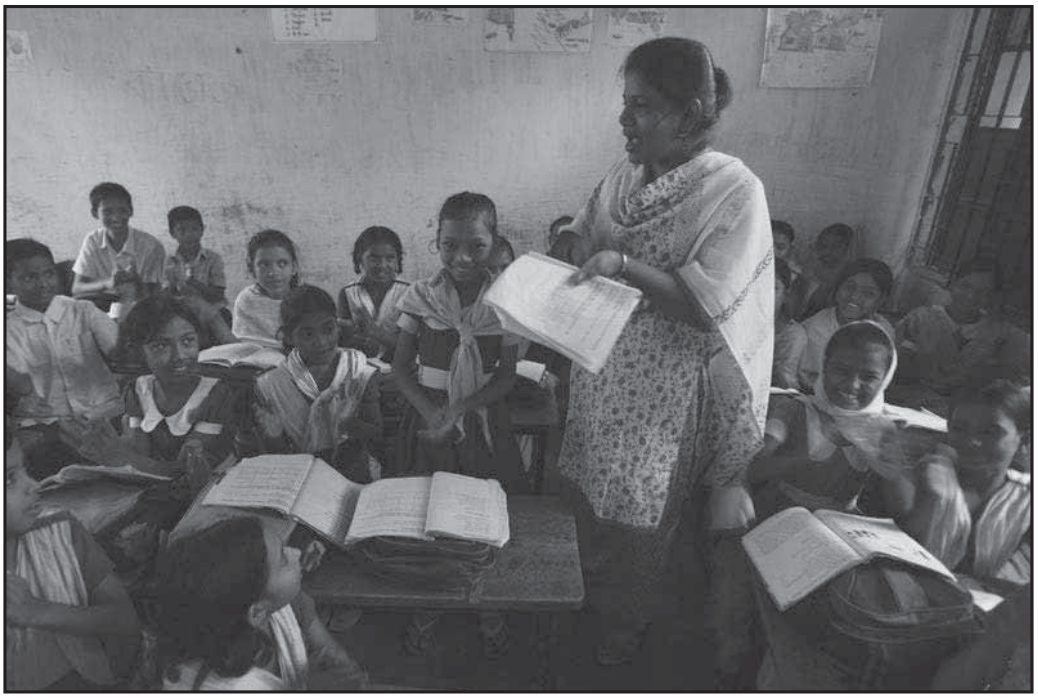

শিক্ষাদানে পাঠ্যবইয়ের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি, কেননা পুঁথি-পুস্তক হল শিক্ষার বাহন। দূর-শিক্ষা পদ্ধতি এ বাহনকে ব্যবহার করেই নানা কারণে বিদ্যালয়ে যেতে অসমর্থ, কিন্তু শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী শিক্ষাথীর পাঠ গ্রহণ বা শিক্ষা নিশ্চিত করে। দিনে দিনে প্রযুক্তির উন্নয়নে শিক্ষার নানা উপকরণ আবিষ্কৃত হলেও পাঠ্যপুস্তকের বিকল্প এখনো কিছুই হতে পারেনি। দূর-শিক্ষায় যে পাঠ্যবই ব্যবহার করা হয় তাকে স্বশিখন সামগ্রী (self-learning material, SLM) বলে। এগুলোকে এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে শিক্ষার্থী নিজে নিজে পড়ে বুঝতে পারে। তাই, এসব পাঠ উপকরণ প্রণয়নে প্রয়োজন বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং বিশেষ দক্ষতা।

এই নিবন্ধে প্রথমেই থাকছে দূর-শিক্ষা বিষয়ক নানা আলোচনা, যেমন- দূর-শিক্ষা কী, কেন এর প্রয়োজন, এর ইতিহাসই বা কী, এর বর্তমান অবস্থা কী, এর উন্নয়নে আমাদের দায়বদ্ধতাই বা কতটুকু।

দূর শিক্ষার ইতিহাস

শর্টহ্যান্ড লিখনের কথা আমরা সকলেই জানি। শর্টহ্যান্ড লিখনের সাথে দূর-শিক্ষার ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

আজ থেকে প্রায় পৌনে তিনশত বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টনে দূর-শিখন অর্থাৎ distance learning শুরু হয়েছিল। আর এর সূত্রপাত হয়েছিল ১৭২৮ সালে বোস্টন গেজেটে শর্টহ্যান্ড শেখার পত্র যোগাযোগ কোর্স চালু করার জন্য Caleb Phillips-এর বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে। আঠারো শতকের ৪০-এর দশকে স্যার আইজ্যাক পিটম্যানের পত্র যোগাযোগ পদ্ধতিতে তাঁর যুগান্তকারী শর্টহ্যান্ড শেখানোর মাধ্যমে দূর-শিক্ষা পদ্ধতি সমাদৃত হতে থাকে। উল্লেখ্য যে, পিটম্যানের সেই শর্টহ্যান্ড আজও ব্যবহার হচ্ছে। এর সূত্র ধরেই ১৮৫৮ সালে লণ্ডন ইউনিভার্সিটি দূর-শিখন পদ্ধতিতে ডিগ্রি প্রদান কর্মসূচি শুরু করে। ১৮৯২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের উইসকন্‌সিন-ম্যাডিসন বিশ্ববিদ্যালয় তাদের পোস্টারে প্রথম Distance Education

শব্দটি ব্যবহার করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়টি শুধু শব্দ ব্যবহার করেই বসে ছিল না ১৯০৬ সালে গ্রামোফোনে লেকচার রেকর্ড করে তা শিক্ষার্থীদের কাছে বিতরণ শুরু করে। এর পর ১৯১৮ সালে দূর-শিখনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হলো University of Cape যেটি বর্তমানে University of South Africa, যা আফ্রিকার সবচেয়ে বড় দূর-শিখন প্রতিষ্ঠান। এর প্রায় ৫০ বছর পর ১৯৬৯ সালে যুক্তরাজ্যে The Open University নামে ব্রিটিশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, যেটি সর্বপ্রথম রেডিও-টিভিতে লেকচার সম্প্রচার শুরু করে। এরই ঠিক অব্যবহিত পরে ১৯৭০ সালে ক্যানাডার উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় Athabaska University এবং ১৯৭৪ সালে জার্মানির উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় Fern-Universitat প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৯ সালে অন-লাইনে ডকুমেন্ট শেয়ার করার জন্য "Web of notes with Links" বাস্তবায়নের প্রস্তাব করেন। এটি বর্তমানে World Wide Web www নামে পরিচিত। আর www-B এনে দিয়েছে দূর-শিখনে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন। এর মাধ্যমে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মুদ্রিত সামগ্রী ও অডিও-ভিডিও একই সময়ে শিক্ষার্থীর কাছে পাঠাতে পারছে। ১৯৯৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের Penn State University-এর অধ্যাপক Gerald Maddox সর্বপ্রথম ইন্টারনেটের মাধ্যমে "Commentary on Art" নামে একটি কোর্স পরিচালনা করেন। এরই সূত্র ধরে ১৯৯৯ সালে learning শব্দটি দূর-শিক্ষায় প্রবর্তিত হয়ে গেল। ২০১২ সালের একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় যুক্তরাজ্যের প্রায় ৪০০,০০০ শিক্ষার্থী দূর-শিখন কার্যক্রমে পড়াশুনা করছে যা স্নাতক পর্যায়ের মোট শিক্ষার্থীর তিন ভাগের এক ভাগ। ২০১৩ সালে দেশটিতে দূর-শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের সরকারী ঋণের ব্যবস্থা করা হয়।

দূর-শিক্ষা কেন?

যুক্তরাজ্যের প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থী দূর-শিখনের আওতায় পড়াশুনা করে। দূর-শিক্ষা শুধু যে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ ব্যবস্থা এমন নয়। এটি অনানুষ্ঠানিক বা উপানুষ্ঠানিক মৌলিক শিক্ষার জন্যও ফলপ্রসূ। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের কেরালা রাজ্যের উদাহরণ দেওয়া যাক।

কেরালা রাজ্যে একসময় মাতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। পুরুষরা সকাল বেলায় প্রায় সময়ই পাড়ার চায়ের দোকানে বসতো, চা পান করতে করতে একে অপরের সমালোচনা করতো। সমালোচনার বিষয় ছিল, বিভিন্ন পরিবারের নারীদের চলা-ফেরা আচার আচরণ ইত্যাদি অর্থাৎ একজন আর একজনের স্ত্রীর বা মেয়েদের সমালোচনা করত। একদিন এক উন্নয়নকর্মী দেখতে পেলেন, এদের কেউ তেমন কাজ-কর্ম করে না আবার লেখা-পড়াও জানে না। তিনি বুঝতে পারলেন এদের পড়াশুনা শেখাতে পারলে সমালোচনার বিষয়টির বিলুপ্তি ঘটবে এবং লোকজনগুলো কর্মমুখী হবে। অনেক ভেবে-চিন্তে তিনি বললেন ''আচ্ছা তোমরা যে সমালোচনা কর, তা যদি একটি বোর্ডে লিখে দেই তাহলে কেমন হয়"। উত্তরে সবাই বলল "অতি উত্তম"। এর ফলে সবাই বিপদে পড়ে গেল। কারণ তারা পড়তে পারছে না যে কি লেখা হয়েছে। শুরু হল পড়াশুনা শেখার তাগিদ। এরপর বোর্ডে আর হচ্ছে না। শুরু করা হল সাইকোস্টাইল করা কাগজের। বিষয়টি পরে সংবাদপত্রে রূপ নেয়। এটি সত্য যে, ভারতের কেরালা রাজ্যে গড়ে উঠেছে ১০০% শিক্ষিত জনগোষ্ঠী। আজো কেরালার জনগোষ্ঠী ভারতে সবচেয়ে বেশি সংবাদপত্র পাঠ করে (সূত্রঃ তপন কুমার দাশ,*পড়ুয়া*, ২য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা)।

সুতরাং দূর-শিখন যেমন উচ্চ শিক্ষার জন্য উপযোগী তেমনভাবে এটি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও সমান উপযোগী। আর এ কথা ভেবেই বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বা বাউবি আইনে বিশ্ববিদ্যালয়টির জন্য সর্বস্তরের শিক্ষা বিস্তারের তাগিদ রয়েছে। তবে কার্যটি সম্পাদন করা তেমন সহজ নয়। আর সে কারণে বাউবির প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য অধ্যাপক ড. শমশের আলী প্রায়ই বলতেন-

... দূর শিখন ব্যবস্থাপনা হল কবর থেকে লাশ তোলার মত হাত ধরে টান দিলে হাত চলে আসবে, পা ধরে টান দিলে পা চলে আসবে, সুতরাং সামগ্রিক বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে। সাহায্যকারীরা সহযোগিতা করে না, কারণ তাঁরা এ কাজের সাথে পরিচিত নন।

প্রচলিত পদ্ধতির লোকজনের সাহায্য ছাড়া দূর-শিক্ষা কার্যক্রম ফলপ্রসূ করা যায় না। তবে পূর্বশর্ত হল তাদের সক্ষমতা বাড়াতে হবে। যেমন- স্বশিখন সামগ্রী প্রণয়নের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ লেখক, সম্পাদক, ও ইলাস্ট্রেটর; অডিও-ভিডিও সামগ্রী প্রণয়নের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ বক্তা, সম্পাদক ও প্রযোজক এবং টিউটোরিয়াল সেবার সাথে জড়িত টিউটরদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন হয়। দূর-শিক্ষার সাথে জড়িতদের প্রশিক্ষণ দেওয়া না হলে শিক্ষা কার্যক্রমের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। অনেকে হয়ত বলবেন মুখোমুখি পাঠদানই উত্তম প্রক্রিয়া। স্যার আইজ্যাক আইস্টাইনের বক্তব্য তা প্রমাণ করে না। তিনি বলেন-

..... I never teach my pupils; I only attempt to provide the conditions in which they can learn.

দূর-শিখন ব্যবস্থা এ কাজটাই করে। শিক্ষার্থীর শেখার কাজে সহায়তা করে। এই সূত্রে ব্রিটিশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের "Future Education Project" এর কথা উল্লেখ করা যায়।

এ প্রকল্পটি 'ভবিষ্যতে শ্রেণিকক্ষ থাকবে না' এমন ধারণার উপর কাজ করছে। ইতোমধ্যে তাদের উচ্চ শিক্ষার তিন ভাগের এক ভাগ শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষ ছেড়ে দিয়েছে। তারা অনুমান করছে বাকি ২ ভাগও ভবিষ্যতে ছেড়ে দেবে।

এতক্ষণ দূর-শিক্ষার ইতিহাস, এর প্রয়োজন এবং এর ব্যবস্থাপনার বিষয় আলোচনা করা হল। দূর-শিক্ষার পাশাপাশি উন্মুক্ত ও দূর-শিখন শব্দগুলোও ব্যবহার করা হয়েছে। এই শব্দগুলো সমার্থক অর্থে ব্যবহার করা হলেও এদের শাব্দিক অর্থ ভিন্ন। এবার তাহলে আসুন এগুলোর অর্থ জেনে নিই।

উন্মুক্ত ও দূর-শিখন (Open & Distance learning; ODL) কথায় আছে "example is better than precept"। সুতরাং বিষয়টি একটি উদাহরণের সাহায্যে বর্ণনা করা থাক। জওহরলাল নেহেরু রাজনৈতিক ও পেশাগত কারণে প্রায় সময়ই বাড়ির বাইরে থাকতেন, কারাবাসে থাকতেন। তাই তাঁর কন্যা ইন্দিরা গান্ধীকে ছোট বেলায় এক বিশেষ পদ্ধতিতে বিশ্ব ইতিহাস ও সংস্কৃতি শিক্ষা দিয়েছিলেন। একবার এলাহাবাদ থাকার সময় ইন্দিরাকে প্রতিদিন একটি করে চিঠি পাঠাতেন। এতে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আদিবাসীর ইতিহাস ও সংস্কৃতি লিখে পাঠাতেন। ১৯২৮ সালে চিঠিগুলো সংকলন করে *Letters to a Daughter from a Father* নামে বইটি প্রকাশিত হয়। এটি দূর-শিক্ষার উদাহরণ নয় কী? যখন শিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মাঝে মুখোমুখি যোগাযোগ থাকে না তখন তাকে দূর-শিক্ষা বলা হয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু" 'শিক্ষক' আর ইন্দিরা 'শিক্ষার্থী'। পাঠদানের সময় একে অপর থেকে দূরে থাকার কারণে মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ ছিল না। তাই এটি দূর-শিক্ষা।

ছোট বেলায় মাতৃহীন ইন্দিরা তাঁর ফুপু পণ্ডিত বিজয়লক্ষ্মীর কাছে মানুষ হয়েছেন। জওহরলাল নেহেরুর চিঠিগুলো বোঝার ক্ষেত্রে তিনি ইন্দিরাকে সহায়তা করতেন মাত্র। সুতরাং বিজয়লক্ষ্মী এখানে নেহেরুর মাধ্যম। এক্ষেত্রে বিষয়টি আর দূর-শিক্ষা রইল না হয়ে গেল উন্মুক্ত ও দূর-শিখন (open and distance learning) বা ODL। ODL-এ শিক্ষকের মুখোমুখি সহায়তার বিষয়টার গুরুত্ব ওপর দেয়। তাই পৃথিবীর সব উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ই নির্ধারিত জায়গায় ছুটির দিনে শিক্ষার্থীর কাছাকাছি সময়ে টিউটর দ্বারা টিউটোরিয়াল সেবা প্রদান করে। সুতরাং দূর-শিক্ষা (DE) হল উন্মুক্ত ও দূর-শিক্ষার (ODL)-এর উপ-সেট। ODL-এর পরিধি ব্যাপক। এতে মুদ্রিত সামগ্রী ব্যবহারের পাশাপাশি অডিও, ভিডিও, আইসিটি উপকরণ ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। এর বাইরেও পাঠে সহায়তার জন্য রয়েছে টিউটোরিয়াল ব্যবস্থা। দূর-শিখনের প্রতিটি ব্যবস্থাপনা দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করতে পারলেই উন্মুক্ত ও দূর-শিখন পদ্ধতি ফলপ্রসূ হবে, অন্যথায় এর গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি) শুরু থেকেই উন্মুক্ত ও দূর-শিখন পদ্ধতিতে কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। বাউবির শিক্ষা কার্যক্রম যে সকল মিডিয়া ব্যবহার করে তা নিচে দেওয়া হল:

মিডিয়া	ধরন	শিক্ষার্থীর সক্রিয়	ব্যবহার
মুদ্রিত সামগ্রী	স্ব-শিখন সামগ্রী	পাঠক হিসেবে অসক্রিয় থাকে	বহুল ব্যবহৃত
শ্রবণ	রেডিও সম্প্রচার	শ্রোতা হিসেবে অসক্রিয় থাকে	মাঝামাঝি পর্যায়ে ব্যবহৃত
শ্রবণ-দর্শন	টিভি সম্প্রচার	দর্শক হিসেবে সক্রিয় থাকে	মাঝামাঝি পর্যায়ে ব্যবহৃত
আইসিটি	মোবাইল/কম্পিউটার	ব্যবহারকারী হিসেবে সক্রিয় থাকে	খুব কম ব্যবহৃত
মানব	সেশন	উপস্থিত থেকে সক্রিয় অংশ	মাঝামাঝি পর্যায়ে ব্যবহৃত

উপর্যুক্ত মাধ্যমে একটি মিশ্রণ ব্যবহার করে বাউবি-এর কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ইতোমধ্যে এটা একটি প্রতিষ্ঠিত উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলাদেশে দূর-শিক্ষার অবস্থান এ পর্যায়ে আসতে অনেক লম্বা পথ পাড়ি দিতে হয়েছে।

বাংলাদেশে দূর-শিক্ষার ইতিহাস

নমনীয় শিখন (Flexible Learning)-এর আওতায় নৈশ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে দূর-শিক্ষা শুরু হয়েছিল। তবে এ সময় মুদ্রিত সামগ্রী ও রাতের বেলায় মুখোমুখি সেশন পরিচালনার মাধ্যমে নৈশ বিদ্যালয় পরিচালিত হত। এর অনেক পরে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ দূর-শিক্ষা কার্যক্রম চালু করার প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবে সাড়া না পাওয়ায় তিনি লোকসভার সংসদদের মাধ্যমে ১৯৩৭ সালে স্ব-শিখন সামগ্রী ও প্রাইভেট টিউটরিং এর মাধ্যমে নিজেই স্কুল পর্যায়ে দূর-শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেন যা বর্তমানে ওপেন স্কুলিং নামে পরিচিত। কবিগুরুর ওপেন স্কুলিং দীর্ঘস্থায়ী না হলেও প্রচলিত পদ্ধতির শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার জন্য এই ভূখণ্ড ১৯৫৬ সালে অডিও ভিজ্যুয়াল সেল গঠনের মাধ্যমে স্কুল ব্রডকাস্টিং ব্যবস্থা চালু হয়। ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠানটা অডিও ভিজ্যুয়াল শিক্ষা সেন্টারে রূপান্তরিত করা হয়।

এর পর ১৯৭৮-৮০ সাল পর্যন্ত রেডিও-টিভিতে নিয়মিত 'শিক্ষার্থী আসর' নামে স্কুলের বিষয়বস্তু সম্প্রচার করা হত। ১৯৮৩ সালে স্কুল ব্রডকাস্টিং প্রোগ্রাম ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব

এডুকেশনাল মিডিয়া এন্ড টেকনোলজিতে পরিণত হয়। ১৯৮৫ সালে এটি আবার বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডিসট্যান্স এডুকেশন (বাইড)-এ পরিণত হয় এবং বিএড নামে স্নাতক পর্যায়ের প্রোগ্রাম পরিচালনা করতে থাকে।

পরে ১৯৯২ সালে জাতীয় সংসদে 'বাউবি আইন ১৯৯২' নামে আইন পাশের মাধ্যমে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং একই আইনের আওতায় বাইড বাউবির সাথে একীভূত হয়ে যায়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এটা উন্মুক্ত ও দূরশিখন পদ্ধতিতে স্কুল পর্যায় থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। অনানুষ্ঠানিক পর্যায়ে শিক্ষা বিস্তারেও এর অবদান অনস্বীকার্য। বাউবি এখন দূর-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মডেলে পরিণত হয়েছে। প্রযুক্তির উন্নয়নে দূর-শিক্ষা পদ্ধতিতে যোগ হয়েছে নতুন নতুন মাত্রা। যেমন- পত্রযোগাযোগ পদ্ধতিতে ধারাবাহিকভাবে রেডিও-টিভি সম্প্রচার এবং সম্প্রতি আইসিটি উপকরণ যেমন- মোবাইল ও কম্পিউটারকে শিক্ষার প্লাটফরম বা মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। বাংলাদেশ এর প্রতিটাই ব্যবহার করছে। ১৯০৭ সালে বাউবি মোবাইল প্রযুক্তি ব্যবহার শুরু করেছিল। বর্তমানে ই-লার্নিং ব্যবহারের চেষ্টা চলছে।

ইতোমধ্যে বাউবির স্ব-শিখন সামগ্রীগুলো উন্মুক্ত শিক্ষা সামগ্রী (Open Educational Resource, OER) হিসেবে ওয়েব সাইটে দিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে সেগুলো যে কেউ ব্যবহার করতে পারে। বর্তমানে OER এর আওতায় Massive Online Open Course, MOOC, Moodle teacher ইত্যাদির মাধ্যমে বিশ্বের নামিদামি বিশ্ববিদ্যালয় দূর-শিক্ষা কর্মসূচি চালাচ্ছে।

এর পাশাপাশি গড়ে উঠেছে ওয়েবভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যেমন- Khan Academy। না বলে পারছি না যে, এই খান একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা একজন বাঙালী। জনশ্রুতি আছে এই বলে যে, একাডেমীর জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় মাইক্রোসফটের মালিক বিল গেইটস্ এটি ক্রয়ের প্রস্তাব করেন। উত্তরে মি. খান বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি মি. গেইটসকে বলেন "এটি কেনার পয়সা তোমার কাছে নেই।" এই খান একাডেমীর মূল সম্পদ শুধু লার্নিং ম্যাটেরিয়াল অর্থাৎ শিখন সামগ্রী। ওয়েবভিত্তিক শিখন সামগ্রীর ব্যবহার করে বিশ্বের কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয় Z-degree প্রদান করছে। যেহেতু তারা নিজেরা লার্নিং ম্যাটেরিয়াল তৈরি না করে ওয়েব ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করে তাই তাদের খরচ হয় না, ফলে Zero Cost-এ ডিগ্রী প্রদান করছে। তাই এর নামকরণ হয়েছে Z-degree.

ওডিএল ব্যবস্থাপনা

ODL ব্যবস্থাপনা একটা সামগ্রিক ব্যাপার। এর প্রত্যেকটি ক্ষেত্র, –কার্যক্রম কাঠামো ব্যবস্থাপনা, মুদ্রিত সামগ্রী প্রণয়ন, অমুদ্রিত উপকরণ উন্নয়ন (অডিও, ভিডিও) এবং শিক্ষার্থী সহায়ক সেবা এগুলোর জন্য চাই সঠিক পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ যাতে প্রোগ্রামের গুণগত মান ঠিক থাকে। রিসোর্স সংকটের কারণে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রচলিত পদ্ধতির রিসোর্স যেমন লেখক, সম্পাদক, অডিও বক্তা, ভিডিও বক্তা, টিউটর ইত্যাদির উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। এরা ODL পদ্ধতির সাথে সম্পৃক্ত নয়, তাই প্রায় সময়ই কার্যসম্পাদনে অংশীদারিত্ব নেয় না। তাঁদেরকে যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে নিজের করে নেওয়া উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়েরই দায়িত্ব। ODL বিষয়ে সক্ষমতা উন্নয়ন হলেই বাইরের রিসোর্স-পারসন দূর শিক্ষা কার্যক্রমকে নিজের করে নেবে এবং পূর্ণ সহায়তা প্রদান করবে। এর ফলস্বরূপ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে নিশ্চিত হবে শিক্ষার গুণগত মান।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এর উদ্দেশ্যে যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদান করা অর্থাৎ যে শিক্ষার চাহিদা আছে, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় শুধু সেই শিক্ষাই প্রদান করবে, আবার যে শিক্ষার চাহিদা নেই উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সে শিক্ষা প্রদান করবে না। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি) এ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। ১৯৯২ সালে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)-র আর্থিক সহায়তায় এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমে একটি প্রকল্প আকারে শুরু হয়েছিল। প্রকল্পটা প্রণয়ন করা হয়েছিল বিদ্যমান তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে। বিদ্যমান তথ্যের ভিত্তিতে বাউবির জন্য কতিপয় প্রোগ্রাম নির্ধারণ করা হয়েছিল। প্রকল্প কার্যক্রম শুরু করার পর বাউবি সারা দেশে শিক্ষা চাহিদা জরিপ চালায়। এই জরিপে বিদ্যমান তথ্যের ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রোগ্রামের সাথে আরো কতিপয় প্রোগ্রাম যোগ হয়েছিল। এর মধ্যে কম্পিউটার শিক্ষা, আরবি শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং কোন নতুন প্রোগ্রাম চালু করার সময় তার চাহিদা জরিপ চালানো প্রয়োজন। কেননা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো একটা উদ্দেশ্যে হল, ব্যয়সাশ্রয়ী প্রোগ্রাম পরিচালনা করা। অধিক ব্যয় বহুল প্রোগ্রাম উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় চালাবে না। কথায় আছে, 'খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি' এমন কাজ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় করে না। কোর্স ডিজাইন করার সময় এ দু'টি বিষয়ে সর্বদা গুরুত্ব দেওয়া হয়।

স্ব-শিখন সামগ্রী

পূর্ববর্তী আলোচনায় বারবার মুদ্রিত স্ব-শিখন সামগ্রী এবং অমুদ্রিত (অডিও, ভিডিও ও আইসিটি) উপকরণের কথা

এসেছে। অমুদ্রিত সামগ্রী যতই চিত্তাকর্ষক ও নান্দনিক হোক না কেন মুদ্রিত সামগ্রীর মত শক্তিশালী মাধ্যম আর হতে পারে না। দূর-শিক্ষা কার্যক্রম চালনার জন্য ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় চরিত্রে থাকে স্ব-শিখন সামগ্রী। এর মান খারাপ হলে সামগ্রিক কাজটির গুণগত মান খারাপ হয়, আবার এর মান ভালো হলে সামগ্রিক প্রোগ্রামের গুণগত মান ভালো হয়। কেননা বিশ্বের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় মুদ্রিত সামগ্রীর উপর নির্ভরশীলতা প্রায় ৮০-৯০%। মূলত স্ব-শিখন সামগ্রী দূর-শিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষার প্লাটফরম বা মঞ্চ। শিক্ষক এমনভাবে বিষয়বস্তু বর্ণনা করবেন যাতে শিক্ষার্থী তাঁকে পাঠ্যবইয়ের মধ্যে খুঁজে পায়।

স্ব-শিখন সামগ্রী প্রণয়নের সময় শিখনের তাত্ত্বিক প্রয়োগ থাকতে হবে। নানা ধরনের শিখন তত্ত্ব রয়েছে, এর মধ্যে বক্তৃতা তত্ত্ব (Instructivist), আচরণ তত্ত্ব (Behaviorist), গঠনমূলক তত্ত্ব (Constructivist) এবং সংযোগ তত্ত্ব (Connectivist) প্রধান। কীভাবে এগুলোর প্রয়োগ স্ব-শিখন সামগ্রীতে করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করি।

এক সময়ে ধারণা করা হত, গুরু হল বিদ্যার ভাণ্ডার এবং শিক্ষার্থী হল শিক্ষা ভিক্ষার্থী। শিক্ষার্থী গুরুর দীক্ষা নেবে মাত্র। দীক্ষা সাধনার ধন। দীক্ষা নেওয়ার জন্য গুরুর সাথে থাকতে হত। এটা মূলত গুরুকেন্দ্রিক, শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক নয়। গুরু শিক্ষা-দীক্ষা উভয়ই দিয়ে থাকেন এবং এ দুয়ে মিলে যে শিক্ষা সেই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। স্ব-শিখন সামগ্রীতে অনুশীলন প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষক বক্তৃতা তত্ত্বের প্রয়োগ করতে পারেন। তাই লেখার সময় লেখক হিসেবে নির্দেশনামূলক বাক্য প্রয়োগের মাধ্যমে এ তত্ত্বটি পাঠ্যপুস্তকে আনতে পারেন। লেখার বাক্য হবে সরল, তবে তরল হবে না এবং জটিল বাক্য ব্যবহার করা উচিত হবে না। প্রেষণা সৃষ্টি করা হবে লেখকের মূল উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে একটি উদাহরণ দেওয়া যাক ধরুন একজন লেখক 'যোগাযোগ কী' তা বোঝানোর জন্য নিচের উপায়ে লিখছেন।

যোগাযোগ

সকালে মায়ের ডাকে আপনার ঘুম ভাঙ্গল। মায়ের সাথে আপনার যোগাযোগ হল। বাড়ি থেকে বের হয়ে রিকসাওয়ালার ভাড়া ঠিক করলেন। রিকসাওয়ালার সাথে আপনার যোগাযোগ হল। শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষকের পড়া শুনলেন। শিক্ষকের সাথে আপনার যোগাযোগ হল। শিক্ষকের পরামর্শে রেফারেন্স বইটি পড়লেন। লেখকের সাথে আপনার যোগাযোগ হল।

এভাবে পারিপার্শ্বিক অবস্থার বর্ণনা দেওয়ার মাধ্যমে ব্যবহারিক ও গঠনমূলক লার্নিং তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটানো সম্ভব। এটাই মূলত শিক্ষার সৃজনশীল ধারণা। বর্তমানে এ ধারণাটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

লেখার সময় অবশ্যই পরিবেশের বর্ণনাটি এমন হবে যেন শিক্ষার্থী বিষয়বস্তুর বাস্তবতা খুঁজে পায়। আলবার্ট আইনস্টাইন তার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জার্নালের জন্যও লিখেছেন, আবার সহজবোধ্য করে সাধারণ জনগণের জন্যও লিখেছেন। সুতরাং লেখকের মুন্সিয়ানার উপর নির্ভর করে কোন বিষয়টি কীভাবে শিক্ষার্থীদের জন্য লিখবেন। লেখার সময় অতিরিক্ত পাঠের জন্য কতিপয় শিখন সামগ্রীর সূত্র বলে দেওয়া যায়, এভাবে সংযোগ তত্ত্বের সন্নিবেশ ঘটানো যায়। সংযোগ তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল, শিক্ষার্থীকে শিখন সামগ্রীর সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিলে সে নিজে নিজেই পড়তে শিখবে। অপর দিকে, গঠনতত্ত্বের মূল প্রতিবাদ্য বিষয় হল, শিক্ষার্থীকে সহায়তা করলে পরিবেশ থেকে সে নিজে নিজেই শিখবে। তাকে শুধু কতিপয় Conditioning অর্থাৎ পরিবেশ সৃষ্টি করে দিতে হবে। কর্মতৎপরতা ও উদাহরণের মাধ্যমে পাঠ্যবইয়ে এটা করা সম্ভব।

স্ব-শিখন সামগ্রী বনাম বাজারের বই

বাজারের বই আর স্ব-শিখন সামগ্রীর মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। যেমন- বাজারের বইতে কাসপিয়ান লেকের কথা রয়েছে, অন্য দিকে স্ব-শিখন সামগ্রীতে ফয়েজ লেকের কথা থাকতে হবে। অর্থাৎ স্ব-শিখন সামগ্রী দেশীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির আদলে তৈরি করতে হবে। এ ছাড়া স্ব-শিখন সামগ্রীর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

১. স্ব-ব্যাখাত = স্ব-শিখন সামগ্রী এমনভাবে লেখা হয় যাতে শিক্ষকের সাহায্য ছাড়া শিক্ষার্থী এটি পড়ে বোঝতে পারে। তাই ভাষা হবে সহজ ও সরল। শিক্ষার্থী পড়বে এবং নির্দেশাবলী অনুযায়ী কাজ করবে। ইংরেজিতে built-in বলে একটি শব্দ আছে। এর অর্থ তৈরীর সময় যুক্ত করে দেওয়া। ইলেক্ট্রনিক সরঞ্জামে এর প্রয়োগ দেখা যায়। উদাহরণ হিসেবে ডেক্সটপ কম্পিউটারের সাউন্ডবক্স বাইরে থাকে, কিন্তু ল্যাপটপের সাউন্ডবক্স ভিতরে থাকে অর্থাৎ বিল্ট-ইন। সুতরাং শিক্ষক স্ব-শিখন সামগ্রীর সাথে বিল্ট-ইন। অর্থাৎ শিখনের অবস্থান স্ব-শিখন সামগ্রীর মধ্যে বিরাজ করে।

২. স্বয়ংসম্পূর্ণ = স্ব-শিখন সামগ্রীকে মডিউল বলে। মডিউল শব্দটি এসেছে লুনার মডিউল থেকে। যা নিয়ে মানুষ চাঁদে গিয়েছিল। এটি ছিল একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ যান। শুধু তাই নয়, এর প্রতিটি অংশও ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। দূর-শিক্ষা কার্যক্রমের শিক্ষার্থীরা ভাল কোন লাইব্রেরী থেকে দূরে, শিক্ষক থেকে দূরে, মুখোমুখি ক্লাশে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ তার নেই; সুতরাং তার

হাতে যে সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় তা অবশ্যই স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। এর প্রতিটি ইউনিট যেমন স্বয়ংসম্পূর্ণ, তেমনিভাবে এর অন্তর্গত পাঠগুলোও স্বয়ংসম্পূর্ণ। যেমনটা হয়েছিল মূল যান থেকে বিছিন্ন হয়ে অন্য একটা যান নিয়ে নভোনারী চাঁদে অবতরণ করেছিল, তা ছিল সম্পূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ। সুতরাং শিক্ষার্থীকে যে কোর্স প্যাক দেওয়া হবে সেটা অবশ্যই স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে।

৩. স্ব-নির্দেশিত = বাজারের পাঠ্য বইয়ে, সাধারণত নির্দেশনা থাকে না। কিন্তু স্ব-শিখন সামগ্রীতে বিশেষ কাঠামো প্রয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন আইকন বা ইঙ্গিতের মাধ্যমে কিছু নির্দেশনা দেওয়া হয়। আর এই নির্দেশ অনুযায়ী শিক্ষার্থী তা পড়েন, অনুশীলন করেন এবং পরিশেষে স্ব-মূল্যায়নের মাধ্যমে ফিডব্যাক প্রদান করেন।

৪. স্ব-প্রণোদিত = স্ব-শিখন সামগ্রী এমনভাবে লেখা হয় তা থেকে শিক্ষার্থী নিজ পাঠে আগ্রহী হন। ফলে পড়া থেকেই সে ধারণার গভীরে পৌঁছায় এবং শিখন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। লেখক নানা উদাহরণ, অনুশীলন, কর্মতৎপরতা, পরিবেশ- নির্ভর আলোচনা ইত্যাদি সংযোজনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে পাঠে ধরে রাখার ব্যবস্থা করতে পারেন।

৫. স্ব-মূল্যায়ন = প্রকৃতিগতভাবে দূর শিক্ষার্থী শিক্ষক ও তাঁর সতীর্থ শিক্ষার্থী থেকে আলাদা। মুখোমুখি শ্রেণিকক্ষে দ্বিমুখী যোগাযোগ হয়; তাই সেখানে শিক্ষার্থী তাৎক্ষণিক ফিডব্যাক পান। তাই দূর শিক্ষার্থীকে তার স্ব-শিখন সামগ্রীতে সন্নিবেশিত স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্নমালা অনুশীলনের মাধ্যমে নিজের মূল্যায়ন নিজে করতে পারবে এবং এগুলো থেকে নিজে নিজে ফিডব্যাক পাবে।

উপসংহার

উপরের আলোচনায় স্ব-শিখন সামগ্রীকে দূর-শিক্ষার বাহন বলা হয়েছে। এটি শুধু বাহনই না, পাঠদানের মঞ্চ। কারণ শিক্ষক তার লেখনীর মাধ্যমে এর ভিতরে অবস্থান করেন এবং শিক্ষার্থী পড়ার সময় তার সঙ্গ অনুভব করেন। পরে টিউটর মুখোমুখি সেশনে তাকে ট্রান্সফরম করেন। সুতরাং দূর-শিখনে টিউটর হল শিক্ষকের মাধ্যম। আশা করছি, এ আলোচনাটি আপনাকে দূর-শিক্ষা ও স্ব-শিখন সামগ্রী সম্পর্কে মন্ত্রণা দিতে পেরেছে। 'মন্ত্রের আসল উদ্দেশ্য মননে সাহায্য করা।' সুতরাং দূর-শিক্ষা সম্পর্কে পাঠকের ভাবনার রাজ্যে নতুন তরঙ্গের সৃষ্টি হবে।

মো. মিজানুর রহমান
ওপেন স্কুল
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

পাঠক-লেখক-শুভানুধ্যায়ী

সমীপেষু–

সাক্ষরতা বুলেটিন-এর প্রকাশনার প্রায় চৌদ্দ বছর পূর্ণ হতে চলেছে। এই দীর্ঘ সময়ে আমাদের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি আপনাদের শুভেচ্ছা, সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষণা। আর তা আমরা বিরতিহীনভাবে পেয়েছি বলেই বুঝতে পারি, এই ক্ষুদ্র পরিকল্পনার যে প্রাথমিক উদ্দেশ্য অর্থাৎ সাক্ষরতা, অব্যাহত শিক্ষা এবং জনসচেতনতা সৃজনে সহায়তা– তার কিছুটা হলেও পূরণ হয়েছে। আমরা আপনাদের সঙ্গে নিয়ে, আপনাদের সহযোগিতা নিয়ে আরো এগিয়ে যেতে চাই।

তাই আগামী সংখ্যা থেকেই আমরা যুক্ত করতে চাই একটি নিয়মিত বিশেষ বিভাগ,– 'পাঠকের পাতা'। এই পাতায় আমরা প্রকাশ করতে চাই *বুলেটিন* সম্পর্কে আপনাদের বিভিন্নমাত্রিক অভিমত, প্রত্যাশা এবং শিক্ষা-সাক্ষরতার সেইসব দিক সম্পর্কে আপনাদের ভাবনা, যা হয়ত আমরা এখনো এই প্রকাশনায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারিনি। আপনাদের সমালোচনাও আমাদের পাথেয় হয়ে উঠবে। যদি কলেবরের ওপর প্রবল চাপ না পড়ে তাহলে আপনাদের পূর্ণাঙ্গ অভিমত আমরা কেবল ভাষাগত সম্পাদনাসহ ছেপে দেবো।

অধিকন্তু, এই কয়েক বছরে আমাদের পত্রিকা পাঠ করে আপনারা যে ধারণা অর্জন করেছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে যদি স্থানীয় কোন শিক্ষা-সমস্যা ও সম্ভাবনাভিত্তিক লেখা পাঠান, তা প্রকাশ করতেও আমরা বিশেষভাবে আগ্রহী। লেখার সঙ্গে ছবি পাঠালে তাও আমরা মুদ্রিত করতে চাই। এ বিষয়ে আপনাদের সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা কামনা করি।

সম্পাদক

শা ও য়া ল খা ন

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস– লক্ষ্য সবার জন্য শিক্ষা

দুনিয়া জুড়ে শিক্ষা জগতকে উজ্জীবিত করার একটি উৎসব ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। কেন আন্তর্জাতিক দিবস পালনের মত একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, সে কাহিনী অনেক লম্বা। কাল পরিক্রমায় ভারতীয় উপমহাদেশে সাক্ষরতা শব্দের প্রথম প্রয়োগ দেখা যায় ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দের আদম শুমারীর দলিল দস্তাবেজে। অক্ষর প্রয়োগ করে অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরি থেকেই, বাক্য তৈরির প্রক্রিয়া জন্ম নেয় সাক্ষর শব্দের। আর সাক্ষরের আগাগোড়া প্রক্রিয়াটির নাম সাক্ষরতা। তবে সাধারণভাবে ১৫ বছর বা তদূর্ধ বয়সের জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান সাক্ষরতাই হচ্ছে বয়স্ক সাক্ষরতা। দুনিয়াব্যাপী যখন থেকে সাক্ষরতাকে উন্নয়নের সূচক হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে, তখন থেকেই সাক্ষরতার সংজ্ঞায় নতুন নতুন মাত্রা যুক্ত করা হচ্ছে। এক সময় যে কোন ভাষায় লিখতে ও পড়তে পারার দক্ষতাকে সাক্ষরতা বলা হতো।

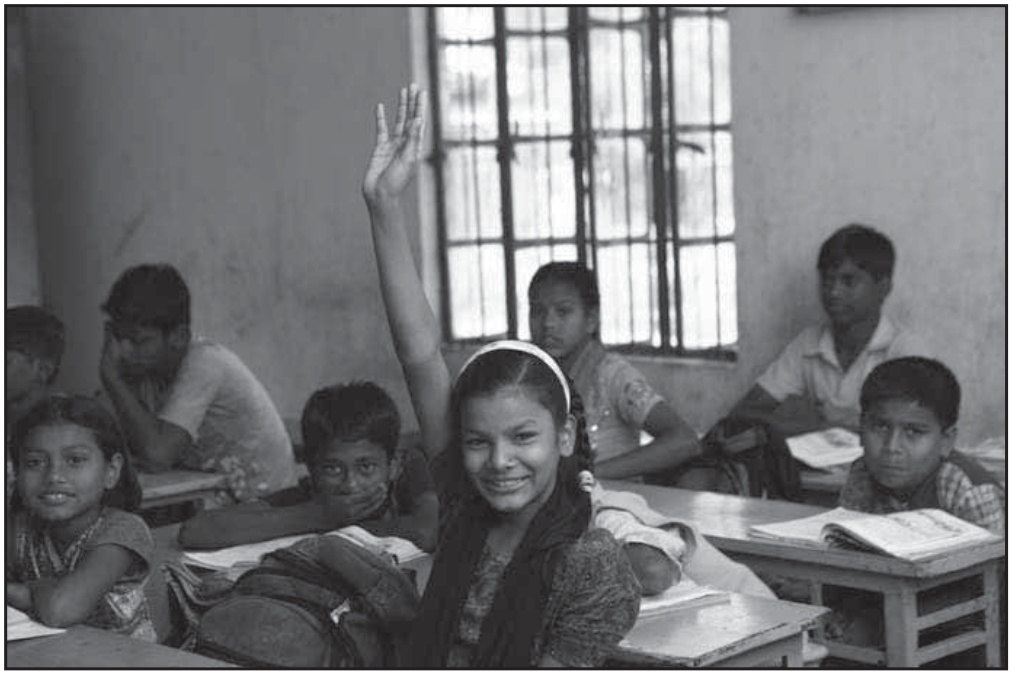

১৯৪০-এর দশকে পড়া ও লেখার দক্ষতাকে 'সাক্ষরতা' বলে অভিহিত করা হয়। ধীরে ধীরে এটা পরিবর্তিত হতে থাকে। ষাটের দশকে পড়া ও লেখার দক্ষতার সঙ্গে সহজ হিসাব-নিকাশের যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষই সাক্ষর মানুষ হিসেবে পরিগণিত হয়। সত্তরের দশকে, পড়া লেখা ও হিসাব-নিকাশের পাশাপাশি সচেতনতার দক্ষতা এবং আশির দশকে পড়া, লেখা, হিসাব-নিকাশ, সচেতনতা ও দৃশ্যমান বস্তুসামগ্রী পঠনের ক্ষমতা সাক্ষরতা দক্ষতা হিসেবে স্বীকৃত হয়। নব্বইয়ের দশকে এসে সাক্ষরতা ভিন্ন রূপ লাভ করে এবং সম্প্রসারিত অবয়বে দক্ষতার ক্ষেত্রে সংযোজিত হয় জীবনের নতুন নতুন চাহিদা। যেমন সামাজিক কর্মকাণ্ডের দক্ষতা, যোগাযোগের দক্ষতা, ক্ষমতায়নের দক্ষতা, জীবন নির্বাহী দক্ষতা, আত্মপ্রতিরক্ষায় দক্ষতা, সাংগঠনিক দক্ষতা ও সাংস্কৃতিক দক্ষতা অর্জনের মূলে রয়েছে সাক্ষরতার মৌলিক দক্ষতা।

এই তিন মৌলিক দক্ষতাকে সম্মিলিতভাবে 3Rs বলা হয়। 3Rs হচ্ছে Reading, Writing ও Arithmatic। মূল ধারণাটি এসেছে জার্মান ভাষা থেকে। একজন সাক্ষর ব্যক্তি মাতৃভাষায় সহজে লিখতে পড়তে ও বুঝতে পারে। মনের ভাব লিখে ও মুখে বলতে পারে এবং দৈনন্দিন হিসাব-নিকাশ করতে ও লিখে রাখতে পারে। ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে সাক্ষরতার যে সংজ্ঞা নিরূপণ করা হয়েছিল সেখানে বলা হয়েছিল যে, মাতৃভাষায় কথা শুনে বুঝতে পারা, মৌখিক ও লিখিতভাবে তা প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন হিসাব করা ও লিখে রাখার ক্ষমতাই সাক্ষরতা দক্ষতা। 3Rs অর্জনের মাধ্যমে সাক্ষরতার মৌলিক দক্ষতাগুলো অর্জন সম্ভবপর হয়।

১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ঘোষিত জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণার ধারা ২৬-এ সাক্ষরতা অধিকারের কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। এই ঘোষণায় বলা হয়, শিক্ষা প্রতিটি মানুষের একটি মৌলিক অধিকার। মৌলিক স্তর পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া কারিগরি ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগও বিস্তৃত হতে হবে। জাতিসংঘের এই ঘোষণার পর সদস্যভুক্ত প্রায় প্রতিটি দেশ সাংবিধানিকভাবে সাক্ষরতাকে প্রতিটি নাগরিকের অধিকার

হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। বাংলাদেশের সংবিধানের ধারা ১৭-তে দেশের প্রতিটি নাগরিকের সাক্ষরতা অর্জনের বিধান রয়েছে।

শিক্ষা মানুষের জীবনধারার কার্যপ্রক্রিয়ার একটা অংশ, পথ চলার সাথী, জীবন যুদ্ধের একটি হাতিয়ার। এমনকি জীবনের সার্বিক অগ্রগতির নির্দেশক আর সাক্ষরতা শিক্ষার প্রাথমিক সোপান। প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক, আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক বা উপানুষ্ঠানিক যে কোন শিক্ষা গ্রহণের প্রস্তুতি হিসেবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অবশ্যই সাক্ষরতা জ্ঞান অর্জন করতে হয়। তাই শিক্ষার আবশ্যিক শর্ত সাক্ষরতা অর্জনে জাতিসংঘ এবং ইউনেস্কোর বিশেষ অনুপ্রেরণায় উদযাপিত হয় আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। এই অনুপ্রেরণা শুরু হয়েছিল বহু আগে ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে পৃথিবী থেকে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য গৃহীত একটা প্রস্তাব থেকে। এই প্রস্তাবে গরিব দেশের মানুষকে সাক্ষর করার জন্য আন্দোলন এবং প্রচার অভিযান চালানোর ওপর জোর দেয়া হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইতালির রোমে নিরক্ষরতা সমস্যা নিয়ে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনেও নিরক্ষরতা দূর করার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। পরবর্তী কালে ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৮-১৯ তারিখ পর্যন্ত জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা ইউনেস্কোর উদ্যোগে ইরানে ১২ দিনব্যাপী একটি বিশ্ব সাক্ষরতা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে পৃথিবীর ৮৮টি দেশের শিক্ষামন্ত্রী ও অন্যান্য শিক্ষা বিশেষজ্ঞগণ অংশগ্রহণ করেন। এই সম্মেলনেই প্রতি বছর ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হয় আরও দুই বছর পর ১৯৬৭ সালে। আফগানিস্তান, কুয়েত ও সিরিয়ায় ভোরবেলায় মসজিদে মসজিদে নামাজ শেষে এ দিনটির কর্মসূচি শুরু হয়েছিল। লাইবেরিয়াতে বিমান থেকে প্রচারপত্র বিলি করা হয়। ইরান, মালী, সিরিয়া, কঙ্গো তিউনিসিয়া, চিলি, ইকুয়েডর, মেক্সিকো, ভিয়েতনাম, লিবিয়া, আলজেরিয়া, গ্যাবন, পাকিস্তান, কম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশে স্মারক ডাক টিকিট ও বিশেষ খাম অবমুক্ত করা হয়। অনেক দেশে গান, প্রবন্ধ ও কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রায় সকল দেশেই সেদিন শোভাযাত্রা সহকারে দিবসটির উদ্বোধন করা হয়েছিল। এছাড়াও সভা, সমাবেশ, নাটক, জারিগান ও লোকসঙ্গীতের মাধ্যমে পুরো দিনটাকে উপভোগ্য করে তুলেছিল। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে নিরক্ষর ব্যক্তিদের শিক্ষাদানের জন্য মালী ও সেনেগালকে সুইজারল্যাণ্ড ছয়শত রেডিও সেট উপহার দেয়। ইরান ও নেদারল্যাণ্ড ইন্দোনেশিয়াকে দিয়েছিল একটি করে মুদ্রণযন্ত্র। তানজানিয়ার সাক্ষরতা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড ও সুইডেনকে দুই লক্ষ ডলার আর্থিক সাহায্য দিয়েছিল। ইউনেস্কোর সহযোগিতায় আলজেরিয়া, ইকুয়েডর, ইথিওপিয়া, গিনি, ভারত, ইরান, মালী, সুদান, সিরিয়া, নাইজেরিয়া, কঙ্গো, চাদ, গ্যাবন, টোগো, উগাণ্ডা, আফগানিস্তান, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ও কেনিয়ায় ওইদিন থেকে সাক্ষরতা কর্মসূচি চালু হয়েছিল।

স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম বারের মতো সাক্ষরতা দিবস উদযাপিত হয় ১৯৭২ সালে। পরের বছর এ দিবসের প্রধান অনুষ্ঠান ঠাকুরগাঁও-এ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের প্রথম নিরক্ষরমুক্ত গ্রাম কচুবাড়ি কৃষ্টপুর এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে এ অনুষ্ঠান ঠাকুরগাঁও-এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ও শিল্পমন্ত্রী এতে যোগ দেন। এ উপলক্ষে প্রথম গণশিক্ষাকর্মী সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৮ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন কারণে সাক্ষরতা দিবস উদযাপনের উৎসাহে ভাটা পড়ে। ১৯৮১ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবসে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি সফল গণশিক্ষা কর্মীদের ঠাকুরগাঁও-এ জাতীয় পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে সম্মানিত করেন। কিন্তু ১৯৮২ সালের মার্চ থেকে ১৯৮৭ সালের আগস্ট পর্যন্ত সরকার পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে জাতীয় পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য কোন সাক্ষরতা কর্মসূচি না থাকায় সাক্ষরতা দিবসের আবেদন তেমন গুরুত্ব পায়নি।

ইতোমধ্যে ১৯০১ সালের ডকুমেন্টেশনে স্থান করে নেয়া সাক্ষরতার সংজ্ঞা পরিবর্তিত, পরিমর্জিত ও বিবর্তিত হতে হতে সাক্ষরতা শিক্ষার মৌলিক ভিত্তির সাথে প্রায় একীভূত হতে চলেছে। সাক্ষরতার সংজ্ঞা কালের বিবর্তনে বিবর্তিত অনেক সমৃদ্ধ এবং চলমান সময়কে ধারণ করে চলছে। আবার অর্জিত দক্ষতার ক্ষেত্রেও সম্প্রসারণ ঘটছে। নতুন সাক্ষররা জীবনের নানা প্রয়োজনে অর্জিত দক্ষতা কার্যকরভাবে ব্যবহার করছে এবং ফলপ্রসু প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে। সাক্ষরতার সংজ্ঞা সময়ের ব্যাপ্তি অনুসারে বিবর্তিত হয়েছে।

১৯০১– মাতৃভাষায় নাম স্বাক্ষর করতে পারার ক্ষমতা।

১৯৫১– স্পষ্ট ছাপার অক্ষরে লেখা যে কোন বাক্য পড়তে পারার ক্ষমতা।

১৯৬১- যে ব্যক্তি বুঝে কোন ভাষা পড়তে পারে সেই সাক্ষর।

১৯৭৪- যে কোন ভাষা পড়তে এবং লিখতে সক্ষম ব্যক্তিকে সাক্ষর হিসেবে গণ্য করা যায়।

১৯৮১ -যে কোন ভাষায় চিঠি লিখতে পারার ক্ষমতা থাকলে তাকে সাক্ষর বলা যায়।

১৯৮৯ –মাতৃভাষায় কথা শুনে বুঝতে পারা, মৌখিকভাবে ও লিখিতভাবে তা ব্যক্ত করার সাথে সাথে প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন হিসাব করার এবং লিপিবদ্ধ করে রাখার ক্ষমতা।

২০০৩ –যে বাংলাভাষায় কথা শুনে বুঝতে পারবে, মৌখিক ও

লিখিতভাবে তা প্রকাশ করতে পারবে। সমাজ পরিবেশকে বিশ্লেষণ করতে পারবে, দৃশ্যমান বস্তুসামগ্রী, যেমন, আলোকচিত্র, লেখচিত্র, পোস্টার, বই, ছবি, চার্ট, ব্যানার ইত্যাদি পড়তে ও ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং সেই সঙ্গে অতি প্রয়োজনীয় হিসাব-নিকাশ করতে ও তা টুকে রাখতে পারবে।

২০০৭ সালে সাক্ষরতার দক্ষতা পরিধি আরও সম্প্রসারিত হয়েছে; 3Rs (Reading-পড়া, Writing-লেখা, Arithmatic হিসাব-নিকাশ) থেকে 6Rs-এ। সম্প্রসারিত নতুন আরো 3Rs হলো- Rights, অধিকার সচেতনতা, Respect; পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ and Resilience; অভিযোজন ক্ষমতা। সন্দেহ নেই অদূর ভবিষ্যত সাক্ষরতার সাথে তথ্যপ্রযুক্তির নতুন নতুন দিকও যুক্ত হবে বাস্তবতার প্রয়োজন।

শিক্ষার যৌক্তিকতার কারণে পৃথিবীব্যাপী আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের প্রেক্ষাপটও পরিবর্তিত হতে চলেছে কাল পরিক্রমায়। ১৯৯০ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী একটাই রব ওঠে সবার জন্য শিক্ষা। সেই ধারাবাহিকতায় ১৯৯০ সালে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ অঙ্গীকার করেন যে, ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা হবে (World Declaration on Education for All, Jomtien, Thailand, UNESCO, 1990)। একই বছর নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শিশু অধিকার বিষয়ক সম্মেলন, ১৯৯০ সালে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত ৯টি জনবহুল দেশে 'সবার জন্য শিক্ষা' শীর্ষক সম্মেলনে বাংলাদেশ বিশ্ব ঘোষণার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে। এর পর ১৯৯৪ সালে স্পেনের সালামাস্কায় ইউনেস্কো কর্তৃক আয়োজিত World Conference on Special Needs Education-এ প্রতিবন্ধী শিশুসহ সকল সুবিধাবঞ্চিত শিশুর শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থায় একীভূত শিক্ষা দর্শন বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১৪-১৮ জুলাই ১৯৯৭ সালে জার্মানির হামবুর্গে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বয়স্ক সম্মেলনেও বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে এবং হামবুর্গ ঘোষণা মতে ১৯৯৭ সাল থেকে বাংলাদেশেও দেশব্যাপী আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস এবং বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের অনুষ্ঠানসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস এবং বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে সভা সেমিনার, মেলা, গণসঙ্গীত ও পথ-নাটক পরিবেশন, জাতীয় সংবাদপত্রে ক্রোড়পত্র প্রকাশ, পোস্টার, স্টিকার প্রকাশ এবং বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনে বিশেষ অনুষ্ঠানমালার প্রচারের আয়োজন করা হয়। জেলা ও থানা পর্যায়েও অনুরূপ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও সাক্ষরতার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখা ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমূহকে পুরস্কৃত করা হয়। এসকল বিকাশমান কর্মসূচি ২০০০ সাল অব্দি বেশ ভালোভাবেই পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশের সাক্ষরতা কর্মসূচি সেসময় শুধু দেশে নয়, বিদেশেও প্রশংসা কুড়ায়। ১৯৯৮ সালে চাঁদ, ফ্রান্স, মিসর ও উরুগুয়ের সাথে বাংলাদেশ ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করেছে।

'সবার জন্য শিক্ষা' বিষয়ক জমতিয়েন সম্মেলন, নিউইয়র্ক সম্মেলন, নয়া দিল্লি সম্মেলন, সালামাঙ্কা সম্মেলন এবং হামবুর্গ সম্মেলনের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের নিমিত্তে বাংলাদেশ সরকার জাতীয়ভাবে ২০০০ সাল নাগাদ বাস্তবায়নের জন্যে চারটি লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে–

ক. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির হার ৭৬% (১৯৯১) থেকে ৯৫% ভাগে উন্নীতকরণ;

খ. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রী ভর্তির হার ৭০% (১৯৯১) থেকে ৯৪% ভাগে উন্নীতকরণ;

গ. প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে ঝরে পড়ার হার ৬০% (১৯৯১) থেকে ৩০% ভাগ হ্রাসকরণ ও

ঘ. ২০০০ সালের মধ্যে বয়স্ক সাক্ষরতার হার ৩৫% (১৯৯১) থেকে ৬২% ভাগে উন্নীতকরণ।

শিক্ষা অর্জন বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের কেবল মৌলিক চাহিদাই নয়, এটি একটি সংবিধান স্বীকৃত অধিকার। বাংলাদেশের সংবিধানে স্পষ্টভাবে বলা আছে যে, সরকার একটি গণমুখী সর্বজনীন সমরূপ শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করবে এবং আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সকল শিশুর জন্য অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। এ শিক্ষা সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে এবং সমাজের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম, প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত ও উদ্বুদ্ধ নাগরিক সৃষ্টি করবে। তাছাড়া আইন প্রণয়নের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করবে।

বাংলাদেশ সরকার এই সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে কতিপয় উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন ১৯৭৩/৭৪ সালে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারি ব্যবস্থাপনাধীনে আনয়ন করা হয়েছে। ১৯৮১ সালে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর স্থাপন করা হয়েছে। ১৯৯০ সালে প্রাথমিক শিল্প বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ১৯৯২ সালে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ১৯৯০ সালের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইনের বিধান তদারকির জন্য একটি নতুন সংগঠন, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট (১৯৯০) এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য ১৯৯১ সালে

সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম (Integrated Non-Formal Education Program-INFEP) নামে একটি পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার ৬৯টি থানায় পরীক্ষামূলকভাবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি গৃহীত হয়। ইতোপূর্বে বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে সৃষ্ট 'গণশিক্ষা' কার্যক্রমের বর্ধিত রূপই ছিল ইনফেপ। এই ইনফেপই ১৯৯৫ সালে দেশব্যাপী সাক্ষরতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণের নিমিত্তে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রায় এক দশক কর্মসূচি পরিচালনা করার পর উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোতে পরিণত হয় ২০০৫ সালে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগকে মন্ত্রণালয়ে উন্নীত করা হয়।

২০১৫ সালের সহস্রাব্দ লক্ষ্য অর্জনের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। ২০১০ সালের ২০-২২ সেপ্টেম্বর বিশ্ব-নেতৃবৃন্দ নিউ ইয়র্কের জাতিসংঘ সদর দপ্তরে এক শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হন সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে। আমরা জানি, সহস্রাব্দ লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে শিক্ষা সংক্রান্ত দুটি লক্ষ্য-

ক. ২০১৫ সালের মধ্যে সকল শিশু প্রাথমিক স্তর সমাপ্ত করার ব্যবস্থা;

খ. শিক্ষায় লিঙ্গ-বৈষম্য দূরীকরণ, সম্ভব হলে ২০০৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে এবং ২০১৫ সালের মধ্যে শিক্ষার সকল স্তরে সহস্রাব্দ লক্ষ্যে বয়স্ক সাক্ষরতার বিষয়টি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নেই।

সবার জন্য শিক্ষার ডাকার ঘোষণার ছয়টি লক্ষ্যের মধ্যে চতুর্থটি হচ্ছে '২০১৫ সালের মধ্যে সাক্ষরতার ক্ষেত্রে অন্তত ৫০ শতাংশ উন্নতি অর্জন এবং সকল বয়স্কের জন্য মৌলিক ও অব্যাহত শিক্ষায় সমতার ভিত্তিতে প্রবেশাধিকার। ইতোমধ্যে ২০০০ সালের এমডিজি এবং ডাকার ঘোষণাকে সামনে রেখে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (Poverty Reduction Strategic Plan-PRSP) প্রণয়ন করা হয়, যার অন্যতম লক্ষ্য, বৈষম্যহীন সর্বজনীন শিক্ষা তথা সকলের জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা।

এসব লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনায় (NPA) ২০১৫ সালের মধ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তির নীট হার ৯৫% অর্জন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যে নারীশিক্ষার অগ্রগতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ২০১৫ সালের মধ্যে সকল স্তরের শিক্ষায় জেন্ডার বৈষম্য হ্রাস করার কথাও বলা হয়েছে। নারীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্য বিলোপের জন্য আন্তর্জাতিক দলিল সিডো (CEDAW) সনদে নারীর শিক্ষা অর্জনের সমঅধিকারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

এসব লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনায় (NPA) ২০১৫ সালের মধ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তির নীট হার ৯৫% অর্জন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যে নারীশিক্ষার অগ্রগতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ২০১৫ সালের মধ্যে সকল স্তরের শিক্ষায় জেন্ডার বৈষম্য হ্রাস করার কথাও বলা হয়েছে। নারীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্য বিলোপের জন্য আন্তর্জাতিক দলিল সিডো (CEDAW) সনদে নারীর শিক্ষা অর্জনের সমঅধিকারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

সিডো সনদের ধারা ১০-এ শিক্ষাক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। 'সহস্রাব্দ লক্ষ্য' ও 'সবার জন্য শিক্ষা'- লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই উদ্দেশ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা এক ও দুই তৈরি করা হয়েছিল যথাক্রমে ১৯৯৫ ও ২০০৭ সালে। প্রথম ও দ্বিতীয় দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্রে ও (২০০৫ ও ২০০৯) 'সহস্রাব্দ' ও সবার জন্য শিক্ষা'-র লক্ষ্য গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু সরকার ও দাতাগোষ্ঠী জাতীয় কর্মপরিকল্পনা দু'টিকে উন্নয়ন প্রকল্প তৈরির ক্ষেত্রে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়নি।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের দ্বারপ্রান্তে এসে দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশ পাঁচ লক্ষ্যে সফল এবং তিন লক্ষ্যে পিছিয়ে। ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্য হার ২৯ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্য ছিল। নির্ধারিত সময়ের দুই বছর আগে ২০১৩ সালে দারিদ্র্য হার ২৬ দশমিক ২ শতাংশে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। এমডিজি-র আটটি লক্ষ্যের মধ্যে শিশু মৃত্যুহার হ্রাস ও মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, এই দুটি পুরোপুরি অর্জিত হবে না এমন লক্ষ্যগুলো হলো চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূল, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং লিঙ্গসমতা অর্জন ও নারীর ক্ষমতায়ন। তবে এসব অর্জনকে সফল বলেই ধরে নিচ্ছে বাংলাদেশ। এমডিজির অগ্রগতি নিয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (ইআরডি) প্রকাশিত সর্বশেষ প্রতিবেদনে এমনটাই উল্লেখ করা হয়েছে। লক্ষ্য অর্জনে ৬০টি সূচকের মধ্যে ইতোমধ্যে এক তৃতীয়াংশ সূচকের লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে কিংবা অর্জনের পথে রয়েছে। তন্মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় ছেলে ও মেয়ের অনুপাত উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশকে ১৫টি সূচকে লক্ষ্য অর্জন করতে হলে আরও নজর দিতে হবে বলে মত দেওয়া হয় প্রতিবেদনে। সূচকসমূহের অন্যতম হলো শতভাগ মানুষের

কর্মসংস্থান, ১৫-২৪ বছর বয়সী শতভাগ যুবক-যুবতীকে শিক্ষিত করা। ১৫ বছর উর্ধ্বের সবার জন্য শিক্ষার হার শতভাগে উন্নীত করা।

'সবার জন্য শিক্ষা' শীর্ষক ডাকার ঘোষণা-২০০০ এ উল্লিখিত ৬টি বিশেষ লক্ষ্যও আমাদের জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে প্রভাব রেখেছে। লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ-

১. সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুসহ সকল শিশুর প্রাক-প্রাথমিক ও শৈশবকালীন শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসার;

২. মেয়ে শিশু, সংখ্যালঘু শিশু এবং যুদ্ধ বিগ্রহ ও অরাজক পরিস্থিতির শিকার হয়েছে এমন শিশুসহ সকল শিশুর জন্য ২০১৫ সালের মধ্যে বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা;

৩. শিশু কিশোর ও বয়স্কদের শিক্ষা-চাহিদা নিশ্চিত করা এবং বুনিয়াদি, জীবনঘনিষ্ঠ ও সামাজিক শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচি এমনভাবে প্রণয়ন করা যাতে সকলের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়;

৪. ২০১৫ সালের মধ্যে বয়স্ক সাক্ষরতার হার, বিশেষ করে নারীদের সাক্ষরতা ৫০ ভাগে উন্নীত করা এবং বুনিয়াদি ও তৎপরবর্তী শিক্ষায় বয়স্কদের অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা;

৫. শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে ২০১৫ সালের মধ্যে নারী-পুরুষ সমতা অর্জনের লক্ষ্যে সকল নারীর জন্য মানসম্মত বুনিয়াদি শিক্ষায় পূর্ণ ও সুষম প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা;

৬. শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধন, যাতে সবার পক্ষে অন্তত গণনা করা, পড়তে পারা, পরিমাপ করতে পারা ইত্যাদি শিক্ষাগত দক্ষতা অর্জন সম্ভব হয়।

প্রতি বছর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস এলেই বিভিন্ন মহলে সাক্ষরতার হার নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা শুরু হয়। এ বছরও এর কোন ব্যতিক্রম হয়নি। সাক্ষরতা ও শিক্ষা নিয়ে কাজ শুরু এমন সব মহল থেকে ভিন্ন ভিন্ন হিসেব উঠে এসেছে। কিন্তু একটি অভিন্ন প্রশ্ন সব মহলেই উঁকি দিচ্ছে। নিরক্ষরতার হার ক্রমেই বেড়ে চলছে? বিভিন্ন মহল থেকে উঠে আসা সাক্ষরতার হারের হিসেব বলছে, সাক্ষরতার হারের হিসেবে কোন মিল নেই। এ নিয়ে দেশে কোন সঠিক পরিসংখ্যান নেই।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপনের মধ্য দিয়ে ৬ ধরনের তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। তবে বিবিএসের হিসেব মতে এখনও দেশের ৪০ ভাগ মানুষ নিরক্ষর। ফলে সহজেই অনুমেয় ২০১৪ সালের মধ্যে শতভাগ সাক্ষরের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন হচ্ছে না নির্ধারিত সময়ে। সরকারের ব্যাখ্যা, বিভিন্ন কারণে সে লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো প্রণীত হতে যাচ্ছে 'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪'। অব্যাহত শিক্ষার আওতায় দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং জীবনব্যাপী শিক্ষার প্রসার ঘটানোর মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য এই আইন প্রণীত হচ্ছে। সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয় দু'টি কারণে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন হচ্ছে। 'সবার জন্য শিক্ষা' শীর্ষক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ঘোষণার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে ও সাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ এ আইন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আর নতুন আইনের মাধ্যমে একটি সমন্বিত পদ্ধতি ও কারিকুলাম অনুসরণ করা হবে। এই আইন চালু হলে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপনকারীদের প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার মতো সনদ প্রদান করা হবে। এতে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীরা ষষ্ঠ শ্রেণিতেও ভর্তি হতে পারবে। এবারের আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস-এর শ্লোগান 'টেকসই উন্নয়নের মূলকথা, সাক্ষরতা আর দক্ষতা'। এই শ্লোগানকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, সাক্ষরতার হার ৬৫ ভাগ। একই মন্ত্রণালয়ের সচিব বলেছেন, এ হার প্রায় ৭০ ভাগ। এর আগে একনেক বৈঠকে পরিকল্পনামন্ত্রী বলেছেন শিক্ষার হার ৬৭ ভাগ। গত বছর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অন্য মন্ত্রী বলেছিলেন ৭১ ভাগ। এ ছাড়া ২০১১ সালে প্রকাশিত পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) দুটি আলাদা সমীক্ষায় সাক্ষরতার হার দেখানো হয়েছে ৫২ দশমিক ৩ এবং ৫৯ দশমিক ৮২ ভাগ। বিবিএস এর শেষ হিসেবটি (৫৯ দশমিক ৮২) সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলো গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নিয়েছে। চলতি বছরের (২০১৪) এপ্রিলে ইউনেস্কো প্রকাশিত 'সবার জন্য শিক্ষা: বিশ্ব পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন' পৃথিবীর যে দশটি দেশে বিশ্বের ৭২ ভাগ নিরক্ষর লোক বাস করে বাংলাদেশ তার মধ্যে চতুর্থ স্থানে রয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০০৫-২০১১ সালে বাংলাদেশে বয়স্ক নিরক্ষরের সংখ্যা সাড়ে ৪ কোটির কিছু বেশি। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা বেড়েছে (*যুগান্তর*, ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ পৃ:১)।

বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে সাক্ষরতার হার ছিল ১৬ দশমিক ৮ ভাগ। ১৯৯১ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৩৫ দশমিক ৩; ২০০১ সালে ৪৭ দশমিক ৯; ২০০৮ সালে ৪৮ দশমিক ৮ ভাগ আর ২০০৯ সালের হিসেবে ৫৩ ভাগ। এটা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য। মূলত সাক্ষরতার হার নিয়ে ২০০২ সালে যখন বিতর্ক উঠেছিল তখন এনজিও ছাড়াও খোদ সরকারি প্রতিষ্ঠানই পৃথক তথ্য প্রকাশ করেছিল। যেখানে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সাক্ষরতার হার বলেছিল ৬৫ ভাগ, সেখানে বিবিএস তখন বলেছিল ১১ বয়সোর্ধ্ব সাক্ষরতার হার ৪৬ দশমিক ১৫ ভাগ। আর শিক্ষা নিয়ে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনাকারী এনজিওগুলোর সবচেয়ে বড় মোর্চা গণসাক্ষরতা অভিযান-এর মতে ৭ বছরোর্ধ্ব শিশুদের সাক্ষরতার হার ৪১

দশমিক ৪ ভাগ। পরবর্তী সময়ে ২০০৫ সালে ঢাকা আহছানিয়া মিশন সাক্ষরতার হার নিরূপণে কাজ করেছিল। তাদের মতেও তখন সাক্ষরতার হার ছিল ৪২ ভাগ। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন ব্যানবেইসের সংগৃহীত পরিসংখ্যান মতে, ১৯৯০ সালে সাক্ষরতার হার ছিল ৩৫ ভাগ। সরকারি প্রচেষ্টায় অবস্থার ক্রমোন্নতি হতে থাকায় ১৯৯৫ সালে ৪৭ ভাগ, ২০০০ সালে ৬৪ ভাগ এবং ২০০১ সালে সাক্ষরতার হার শতকরা ৬৫ ভাগে উন্নীত হয়।

এনজিও সমীক্ষা অনুযায়ী পরিকাঠামোর অভাবে দারিদ্র্যপীড়িত পল্লী অঞ্চলের ২০ লাখসহ অন্তত ৪০ লাখ শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রয়েছে। ১১ থেকে ২৫ বছর বয়সের কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীদের মধ্যেও দেড় কোটি নিরক্ষর। ৪৫ বছর বয়সীদের মধ্যে এ সংখ্যা পৌনে ৪ কোটি। ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ২০০১ সালে সাক্ষরতা কর্মসূচি আকস্মিকভাবে বন্ধ করে দেয়া হয় এবং ২০০৩ সালে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে অকার্যকর করা হয়। এর পরে ২০০৫ সাল পর্যন্ত দেশে সরকারিভাবে কোন সাক্ষরতা কর্মসূচি চালু ছিল না। ফলে দেশে সাক্ষরতার হার স্থিতিশীল অবস্থায় থাকেনি, বরং নিম্নগামী হয়।

বিএনএফই বিবিএস-এর যে সমীক্ষার তথ্যকে গ্রহণ করেছে, সেই অনুযায়ী ১৫ তদূর্ধ্ব বছর বয়সী সাক্ষরতার হার ৫৯ দশমিক ৮২ ভাগ। এর মধ্যে সাক্ষর নারীর হার ৫৫ দশমিক ৭১ এবং পুরুষ সাক্ষরের সংখ্যা ৬৩ দশমিক ৮৯ ভাগ। তবে আশার কথা হলো, বিভিন্ন বয়স গ্রুপের মধ্যে ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী মানুষের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৮২ দশমিক ১৭ ভাগ এবং ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সীদের মধ্যে এই হার ৭৮ দশমিক ৫৮ ভাগ। এই হার ঊর্ধ্বমুখী। বিপরীত দিকে বর্তমানে (২০১৩ সালের নভেম্বর পর্যন্ত) প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ভর্তির হার ৯৭ দশমিক ৪ ভাগ। এর মধ্যে মেয়ে শিশুর হার ৯৭ দশমিক ১ ভাগ এবং ছেলে শিশুর হার ৯৫ দশমিক ৪ ভাগ। এই সময়ে ঝরে পড়ার হার ২৬ দশমিক ২ভাগ। যদিও মন্ত্রণালয় বলছে, এই হার ২১ ভাগ। স্কুলে ভর্তির হার বর্তমানে উর্ধ্বমুখী এবং ঝরে পড়ার হার নিম্নমুখী।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সংজ্ঞানুযায়ী যে ব্যক্তি লিখতে, পড়তে, বুঝতে ও গুনতে পারবেন, তাঁকে সাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন বলা হয়। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকারের লক্ষ্যমাত্রা হলো ২০১৪ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করা। ইতোপূর্বে ২০০৬ সালেও একবার পুরো দেশ নিরক্ষরমুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু নানাবিধ কারণে তা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। দেশের সবকটি জেলাকে সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনের আওতায় এনেও দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ সম্ভব হয়নি। লালমনিরহাট, চুয়াডাঙ্গা, রাজশাহী, মাগুরা, গাজীপুর ও জয়পুরহাট সম্পূর্ণ নিরক্ষরমুক্ত করার পরও দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করা সম্ভব হয়নি। কারণ সাক্ষরতা শুধু অর্জন করার বিষয় নয়, চর্চারও বিষয়। নিয়মিত চর্চা না করলে একজন শিক্ষার্থী অনায়াসে অর্জিত সাক্ষরতা ভুলে যায়। এসব বিবেচনায় 'মৌলিক সাক্ষরতা' শীর্ষক ৪৫২ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এতে করে বিএনএফই নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রসঙ্গে অনেক দূর অগ্রসর হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। শুধু আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালনে নয়, এই স্বপ্ন বাস্তবায়নেই নিহিত আছে 'সবার জন্য শিক্ষা' বাস্তবায়ন অঙ্গীকারের বীজ। সবার জন্য শিক্ষা একটা প্রেরণা। এই প্রেরণাই হোক আমাদের পথ চলার শক্তি।

শাওয়াল খান
গবেষক ও কথাসাহিত্যিক

বিজ্ঞপ্তি

আমাদের মাসিক প্রকাশনা *সাক্ষরতা বুলেটিন*-এর গ্রাহক হওয়ার জন্য অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। দীর্ঘদিন থেকে অনেকে এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চেয়ে আমাদেরকে চিঠি দিচ্ছেন। *সাক্ষরতা বুলেটিন* পেতে হলে পাঠকদের কী করণীয় তা আমরা আগেও বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছি। তাদের সুবিধার্থে আবারও জানাচ্ছি, এতদিন *সাক্ষরতা বুলেটিন* বিনামূল্যে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু উচ্চ ডাক মাশুলের কারণে আমাদের পক্ষে আর সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বুলেটিন পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। আগ্রহী পাঠকদের বুলেটিনের গ্রাহক হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। ভবিষ্যতেও *সাক্ষরতা বুলেটিন* বিনামূল্যে পাঠানো অব্যাহত থাকবে। তবে গ্রাহকদেরকে ডাক মাশুল বাবদ বছরে ১০০ টাকা এবং ছয় মাসের জন্য ৫০ টাকা দিতে হবে। এই টাকা সরাসরি অথবা মানি অর্ডারযোগে সম্পাদক, সাক্ষরতা বুলেটিন, গণসাক্ষরতা অভিযান, ৫/১৪ হুমায়ূন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

তপন কুমার দাশ

সাক্ষরতা ও টেকসই উন্নয়ন: সময়ের দাবি

সৃষ্টির আদিকাল থেকে বিভিন্ন কালপর্বে গৃহীত অসংখ্য উন্নয়ন উদ্যোগের ফলেই মানব সভ্যতা বর্তমান রূপ ধারণ করেছে। একদিকে, যেমন অনেক উন্নয়ন উদ্যোগ ছোট অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে সামাজিক ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে, আবার অন্যদিকে, অনেক উন্নয়ন উদ্যোগই বিনষ্ট হয়েছে পরিচর্যা বা লালনের অভাবে। একই সঙ্গে আবার এমন সব উন্নয়ন উদ্যোগও গৃহীত হয়েছে, যার মাধ্যমে একদিকে যেমন কিছুটা সুফল পাওয়া গিয়েছে, আবার অন্যদিকে এসব উদ্যোগের অভিঘাত মানব-সমাজের অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্তও করেছে, এমন কি রুদ্ধ করে দিয়েছে উন্নয়নের নানা ক্ষেত্রকে।

এসব কারণে এক সময় উন্নয়নের সঙ্গে "স্থায়িত্বশীল" অভিধাটি যুক্ত হয় এবং ধীরে ধীরে সারা পৃথিবীতে স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের ধারণা বিস্তার লাভ করে। সে-ও অনেক পুরনো ইতিহাস। কেউ কেউ বলে থাকেন বার থেকে ষোল শতকেও স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের ধারণা পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল এবং গ্রীক নগর রাষ্ট্রের পরিকল্পনায় সামগ্রিকতার উপর জোর দিয়েই গড়ে তোলা হয় রাষ্ট্র। মূলত পরিবার কিংবা রাষ্ট্রের স্থায়িত্বশীলতার প্রশ্নেই টেকসই পরিকল্পনা প্রণয়নের ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

Sustainable development is an organizing principle for human life on a finite planet. It posits a desirable future state for human societies in which living conditions and resource meet human needs without undermining the sustainability of natural systems and the environment so that future generations may also have their needs met.

The United nations Millennium Declaration identified principles and treaties on sustainable development, including economic development, social development and environmental protection. Source: Wikipedia

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন-এর ভাবনা জোরালো হয় পরিবেশ বিষয়ক আলোচনার সূত্র ধরে। দেখা যায়, অনেক উন্নয়ন পরিকল্পনাই পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি করে এবং তার শিকার হয় মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী। এ ধরনের পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য সামষ্টিক উন্নয়ন পরিকল্পনার উপর গুরুত্ব দেওয়ার কথা বিবেচনা করা হয় এবং টেকসই উন্নয়নের ধারণা একটি মৌলিক এজেন্ডায় পরিণত হয়।

মূলত বিগত দুই দশকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প ইত্যাদি সকল খাতেই টেকসই উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সকল ধরনের উন্নয়ন আলোচনাতেই 'সাসটেইনেবিলিটি' একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসে। টেকসই উন্নয়নের মূল কথাই হলো, ভবিষ্যতের ভাবনা বা চাহিদাকে সামনে রেখে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ। শিক্ষা ক্ষেত্রেও ভবিষ্যতের চাহিদা এখন একটি বড় আলোচ্য বিষয়। উৎপাদনমুখী শিক্ষা, বাজারমুখী শিক্ষা কিংবা চাহিদাভিত্তিক শিক্ষা ইত্যাদি সব কিছুই টেকসই উন্নয়নের ধারণাপ্রসূত।

বাংলাদেশে সাক্ষরতা কার্যক্রমের সূত্রপাত স্বাধীনতার অব্যবহিত

পরপরই। প্রাথমিক অবস্থায় সাক্ষরতাকে 3Rs-এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করেই চিন্তা করা হতো। সাক্ষরতা কর্মসূচির সঙ্গে ফ্রেইরিয়ান মুক্তিকামী ধারণা যুক্ত হওয়ার ফলে সাক্ষরতার মাত্রাগত উন্নয়ন নিশ্চিত হয়। কিন্তু সাক্ষরতার স্থায়িত্বশীলতার প্রশ্নটি কাঠামোধীন রূপ লাভ করে আশির দশকে।

নব্বইয়ের দশককে বাংলাদেশে সাক্ষরতা বিস্তারের সুবর্ণ সময় বলা যেতে পারে। এ সময়ে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সাক্ষরতা বিস্তারে এগিয়ে আসে পাঁচ শতাধিক এনজিও। আবার সে সময়েই বিকশিত হয় মৌলিক শিক্ষার সঙ্গে সমন্বিত কারিগরি শিক্ষার এক অপূর্ব মডেল। ইউসেপ (Underprivileged Children's Educational Programs) বাংলাদেশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই মডেলে কারিগরি দক্ষতার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। একই ধরনের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করে প্রশংসিত হয়েছে মটস্ কারিতাস। সিএমইএস, আহছানিয়া মিশন ও ব্র্যাকসহ অন্যান্য এনজিও এ সময়েই কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।

ঐ সময়ে সাক্ষরতা কার্যক্রম বাস্তবায়নের সঙ্গে যুক্ত এনজিওগুলো উপলব্ধি করে যে, সাক্ষরতা দক্ষতার নবায়ন প্রয়োজন এবং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা না গেলে অর্জিত সাক্ষরতা দক্ষতা শিক্ষার্থীর কোন কাজে আসে না। এ উপলব্ধিকে কর্মক্ষেত্রে বাস্তবায়নের জন্যই তখন অনুসারক শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে কোথাও কোথাও গ্রামীণ পাঠাগার কিংবা গণকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯০-৯২ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক APPEAL কর্মসূচির আওতায় প্রণীত সাক্ষরতা ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়ালে অনুসারক শিক্ষাকে একটি মৌলিক উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং এই ম্যানুয়াল অবলম্বনে বাংলাদেশেও শতাধিক কর্মীকে সাক্ষরতা-উত্তর শিক্ষার উপর প্রশিক্ষিত করা হয়। সাক্ষরতা-উত্তর কার্যক্রমের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা পরিপূর্ণতা পায় বিশ্বব্যাংক কর্তৃক সম্পাদিত সমীক্ষায়। হেলেন আবেদজি কর্তৃক প্রণীত 'What We know about Acquisition of Adult Education: Is there any Hope' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রধানত চার ধরনের সমস্যা রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো সাক্ষরতা পরবর্তী চর্চার অভাব এবং নব্য সাক্ষরদের পুনরায় নিরক্ষরতার বৃত্তে ফিরে যাওয়া।

এসব কিছুর ফলেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা বিবেচনায় বিশ্বব্যাংক ও এডিবি-এর সহায়তায় এদেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক এনজিওদের অংশগ্রহণে বাস্তবায়িত হয় ২টি বৃহদাকার 'সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প'। মূলত সাক্ষরতা দক্ষতার টেকসই রূপ দেওয়াই ছিল ঐ দুইটা প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য।

২০০০-পরবর্তী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায়ও সাক্ষরতার সঙ্গে জীবন ও জীবিকাভিত্তিক শিক্ষার ধারণা যুক্ত হয় এবং সাক্ষরতা কোর্স সমাপ্তকারীদের জন্য দক্ষতা উন্নয়নমূলক শিক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এ সময়ে সহায়ক প্রতিষ্ঠানগুলো উপলব্ধি করতে শুরু করে যে, মৌলিক সাক্ষরতা কার্যক্রম অবশ্যই বাজারের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপুর্ণ দক্ষতা উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে হবে।

সাক্ষরতাপ্রাপ্তরা যাতে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে স্ব-উদ্যোগে উৎপাদনমুখী কাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পাশাপাশি দক্ষ শ্রমিক হিসেবে শ্রম বাজারে প্রবেশ করতে পারে সে ব্যবস্থা নিশ্চিত হতে হবে। বস্তুত এ সময়কালে শিক্ষার্থীদের দিক থেকে শিক্ষার চাহিদার ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ায় দক্ষতা অর্জনের চেয়ে কারিগরি দক্ষতাকে প্রাধান্য দিতে থাকে। এর মূল কারণ, গার্মেন্টস্ সেক্টরসহ দেশে ক্রমবর্ধমান শ্রম বাজারের চাহিদা পূরণ। শুধুমাত্র দেশে নয়, মধ্যপ্রাচ্য ও মালয়েশিয়াসহ বিশ্বের নানা দেশের শ্রমবাজারে বাংলাদেশের শ্রমিকদের চাহিদা ও সম্পৃক্তি সম্প্রসারিত হয় এবং দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা উঠে আসে শ্রম বিষয়ক সকল আলোচনায়। ফলে, দেশে দ্রুত বিকশিত হতে থাকে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ।

একই সঙ্গে ধীরে ধীরে বাংলাদেশে সাক্ষরতা কর্মসূচির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে সাক্ষর সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করা হয় এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়। ঢাকা আহছানিয়া মিশন, এফআইভিডিবি, ব্র্যাকসহ নানা এনজিও এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর নানা দেশে জীবনব্যাপী শিক্ষার ধারণা বিস্তরণে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করে "ইউনেস্কো"।

সাক্ষর সমাজ

যে সমাজে সকল মানুষই সাক্ষর এবং যারা নিয়মিত সাক্ষরতার চর্চা করে সে সমাজকেই বলা হয় সাক্ষর সমাজ। শুধুমাত্র সাক্ষরতা অর্জন করলেই হবে না, সাক্ষরতার নিয়মিত চর্চা করতে হবে। ইউনেস্কো, ব্যাংকক থেকে প্রকাশিত APPEAL Manual for Planning and Management for Continuing Education গ্রন্থে বলা হয়েছে, সাক্ষর সমাজ বলতে সে সমাজকে বোঝায়, যে সমাজে সকল লোক শুধু সাক্ষরই নয় বরং সমাজে বিদ্যমান সকল প্রতিষ্ঠান সাক্ষরতার চর্চা ও বিকাশে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে।

অব্যাহত শিক্ষা

যে কোনো বয়সের শিক্ষার্থীদের অর্জিত শিক্ষাকে ধরে রাখা তথা অর্জিত জ্ঞানকে আরও উন্নত করা, সর্বোপরি সাক্ষর সমাজ গড়ে তোলার অপরিহার্য উপায় হলো অব্যাহত শিক্ষা।

অব্যাহত শিক্ষা মানে কেবলমাত্র অব্যাহতভাবে লেখাপড়ার চর্চা করা নয় বরং শিক্ষাচর্চার পাশাপাশি যুগোপযোগী দক্ষতা অর্জন ও আয়-সৃজনী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জীবন মানের উন্নয়ন ঘটানো। অব্যাহত শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তিক প্রতিভা বিকাশের সুযোগ অর্জিত হয়।

অব্যাহত শিক্ষা ও উন্নয়নের সম্পর্ক

ধরে নেওয়া হয় যে, যথোপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও পর্যাপ্ত দক্ষতা অর্জন করে থাকে। তার মাধ্যমে তারা তাদের কাজের মান উন্নত করার পাশাপাশি আয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে পারে। এর ফলে সচ্ছল, সুখী এবং সমৃদ্ধ মানুষ ও পরিবার গঠন সর্বোপরি শক্তিশালী আর্থ-সামাজিক কাঠামো গঠনে অব্যাহত শিক্ষা যথাযথ অবদান রাখতে পারে।

এ ধরনের উন্নত মানবসম্পদ এবং বিশেষ করে শক্তিশালী অর্থনীতি ও উন্নত মানের মানুষকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের ন্যায় তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহ অপ্রতুল সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে ফলপ্রসূ, যথোপযুক্ত এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে। তাছাড়া, সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অব্যাহত শিক্ষার মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য রয়েছে। অধিকাংশ উন্নয়ন-তাত্ত্বিক মনে করেন যে, উন্নয়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র শিক্ষাই যথেষ্ট নয়। তাঁদের মতে, সমাজের কাঠামোগত ব্যবস্থার কারণে সৃষ্ট বেকারত্ব, নিরক্ষরতা এবং সামাজিক বৈষম্য কেবলমাত্র শিক্ষার মাধ্যমে মোচন সম্ভব নয়।

এ সব সমস্যা কাটিয়ে উঠতে অব্যাহত শিক্ষা তথা জীবনব্যাপী শিক্ষাব্যবস্থা দু'ভাবে কাজ করে থাকে। প্রথমত, সমাজে যেসব কাঠামোগত দুর্বলতা রয়েছে তা কাটিয়ে ওঠার জন্য যে ধরনের মানসিক সক্ষমতা ও প্রায়োগিক দক্ষতা অর্জন আবশ্যক, অব্যাহত শিক্ষা সেই প্রয়োজন মেটায়। দ্বিতীয়ত, আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থায় 'ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া'-র যে পদ্ধতি রয়েছে, অব্যাহত শিক্ষা তা পরিবর্তন করে এমন ধরনের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করে, যা জনসাধারণ স্ব-উদ্যোগে এবং স্বীয় চেষ্টায় চালিয়ে যেতে পারেন। অব্যাহত শিক্ষা সমাজের কাঠামোগত পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে মানুষকে শুধু সচেতনই করে না, তাকে, দক্ষ শ্রমিক হিসেবে গড়ে তোলে এবং ক্ষমতায়িতও করে, যাতে সে পরিবর্তন আনতে পারে।

আমাদের দেশে প্রতি বছর উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কোর্স সম্পন্নকারী শিক্ষার্থী ছাড়াও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায় থেকে ঝরে পড়ছে অসংখ্য শিক্ষার্থী। এসব সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদেরকে দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত করতে প্রয়োজন কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ। কিন্তু, আমাদের দেশে কারিগরি শিক্ষাকে জাতীয়ভাবেই কম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, একই সঙ্গে অভিভাবকসহ সকলকে এ ব্যাপারে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে নেওয়া হয়নি সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে তেমন কোনো উদ্যোগ। বর্তমানে মোট শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাত্র ১০% শিক্ষার্থী কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু, একটি দেশের জাতীয় ও সামগ্রিক উন্নয়নে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির কোনো বিকল্প নেই।

অথচ, বিশ্বের স্বল্পোন্নত ৪৮টি দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স অর্জন করে বাংলাদেশ, যার পরিমাণ ৪৪%। রেমিট্যান্স উপার্জনের মূল ভূমিকা পালনকারী হলো প্রবাসী শ্রমিক ও গার্মেন্টস সেক্টরে কর্মরত পোশাক শ্রমিক। বর্তমানে প্রায় ৮ মিলিয়ন লোক প্রায় ১৩২টি দেশে কাজ করছে, এর মধ্যে প্রায় তিন ভাগের দুই ভাগই হচ্ছে আধা দক্ষ বা অদক্ষ প্রবাসী শ্রমিক। প্রবাসী ও পোশাক শ্রমিকদের যদি দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মে নিয়োজিত করা যেত, তাহলে বৈদেশিক রেমিট্যান্স-এর পরিমাণ দ্বিগুণ হতো এবং জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রেও বড় ধরনের ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ করা যেত।

উপর্যুক্ত দিক বিবেচনায় রেখেই দেশে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার প্রণয়ন করেছে 'জাতীয় উন্নয়ন দক্ষতা নীতি ২০১১'। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১-তে দেশে কারিগরি শিক্ষার বিকাশপূর্বক দক্ষ জনগোষ্ঠী বিনির্মাণে সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে এবং এ লক্ষ্যে দিক নির্দেশনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতির বাস্তবায়নে এনজিওসহ সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে একটি কর্ম-পরিকল্পনাও প্রণীত হয়েছে। দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক বিদ্যমান প্রকল্প ছাড়াও বৃহৎ আকারের কর্মসূচি হাতে নেওয়ার কথাও বিবেচনাধীন রয়েছে।

এ অবস্থায় জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতির আওতায় সংশ্লিষ্ট সকল মহলের বিশেষ করে এনজিওদের কাজের সমন্বয় সাধন প্রয়োজন। দেশের সকল মানুষকে বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণীর কাছে দক্ষতা উন্নয়ন শিক্ষাকে জনপ্রিয় করা প্রয়োজন এবং এ লক্ষ্যে কার্যকর নেটওয়ার্কিং গড়ে তোলা প্রয়োজন। তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল নীতি নির্ধারকদের কাছে অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণীর বিশেষ চাহিদাসমূহ তুলে ধরার জন্য সু-সমন্বিত এডভোকেসি উদ্যোগও গ্রহণ করা প্রয়োজন, প্রয়োজন নীতি-নির্ধারণী গবেষণা।

উপর্যুক্ত লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই গণসাক্ষরতা অভিযান সুনির্দিষ্ট কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করেছে এবং সংশ্লিষ্ট সকল সংগঠনকে নিয়েই এসব কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

গণসাক্ষরতা অভিযান-এর

দক্ষতা (Skill) উন্নয়ন কার্যক্রম

গবেষণামূলক কার্যক্রম (Reserch)

- বাংলাদেশে দক্ষতা বিকাশ, তরুণদের বর্তমান অবস্থান শীর্ষক এডুকেশন ওয়াচ গবেষণা-২০১১-২০১২
- অব্যাহত শিক্ষা বিষয়ক কর্মগবেষণা

এডভোকেসি ও নেটওয়ার্কিং কার্যক্রম (Advocacy of Networking)

- নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে বিভিন্ন কমিটিতে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিত্ব করা।
- নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে স্মারকলিপি/ মেমোরেন্ডাম প্রদান।
- পত্র-পত্রিকায় দাবি নামা A wake-up call) প্রকাশ ও টক শো আয়োজন
- নীতি নির্ধারণী সভা, সেমিনার ও গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন ও ক্রোড়পত্র প্রকাশ
- চাকরিমেলা ২০১৩ আয়োজন
- নেটওয়ার্কিং কমিটি ও ফোরাম গঠন ও পরিচালনা

সক্ষমতা উন্নয়ন কার্যক্রম (Capacity Development Program)

- দেশব্যাপী সচেতনতা বিকাশ সভা/ সেমিনার আয়োজন
- এনজিও ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন
- সরকারি কর্মকর্তা, এনজিও এবং নাগরিক সমাজের অন্যান্য প্রতিনিধিদের জন্য পরিকল্পিত পরিদর্শন কার্যক্রম আয়োজন।
- দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন ও দেশব্যাপী বিনামূল্যে বিতরণ।
- উদ্ভাবনী কার্যক্রমের পাইলটিং জুনিয়র সেকেন্ডারি এডুকেশন (জেএসসি)

গণসাক্ষরতা অভিযান দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে অতিদ্রুত ঘটে যাওয়া বৈশ্বিক প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সঙ্গে বাংলাদেশকেও খাপ খাওয়াতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন সাক্ষরতা ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমকে একীভূত করে সারা দেশে জীবনব্যাপী শিক্ষার স্থায়ী কাঠামো উন্নয়ন করা। সমুদয় সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করতে পারলেই দেশে দক্ষ মানব সম্পদের হার বাড়ানো সম্ভব হতে পারে। পৃথিবীর অনেক দেশই টেকসই উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা, প্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষা ঢেলে সাজিয়েছে, পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে সমান তালে এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। এসব পরিবর্তন বা উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে মানুষ এবং মানুষের হাতেই দিন দিন ঘটছে নবতর সংযোজন কিংবা উন্নয়ন। তাই বিশ্বব্যাপী বিশেষ করে দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতির দেশসমূহে বর্তমানে মানব সম্পদ উন্নয়নের উপর সর্বাপেক্ষা বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশও এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। টেকসই উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে সকল তাই সর্বাগ্রে মানুষকে সাক্ষর করা জরুরি, প্রয়োজন মৌলিক সাক্ষরতা নিশ্চিত করা।

তপন কুমার দাশ
উপ-পরিচালক
গণসাক্ষরতা অভিযান

[আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০১৪ উপলক্ষে প্রকাশিত *অঙ্গীকার* শীর্ষক স্মরণিকা থেকে গৃহীত।]

ড. খন্দকার নেছার আহমেদ

শিশু শিক্ষা কার্যক্রমে প্রাথমিক শিক্ষার ভূমিকা

গণশিক্ষা বলতে আমরা বুঝি সবার জন্য শিক্ষা। আর বয়স্ক শিক্ষার সংজ্ঞা হচ্ছে ১৫ ও ততোধিক বয়সী জনসংখ্যার মধ্যে সাক্ষর ব্যক্তিদের সংখ্যা এবং একই বয়সী মোট লোকসংখ্যার শতকরা অনুপাত। আমাদের দেশের ৩৫ লাখ শিশু এখনও প্রাথমিক শিক্ষা সুবিধা লাভের আওতার বাইরে, যা ভাবতেই অবাক লাগে। আমাদের কাঙ্ক্ষিত মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা এখনও নাগালের বাইরে। অথচ গণশিক্ষার বিস্তারে প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই। শিক্ষাকে শুধু বিত্তবানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সমাজের সর্বস্তরের গণমানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। তাই গণশিক্ষার সফল বিস্তারে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব সমধিক। সাধারণত শৈশবকালীন শিক্ষা ব্যতীত প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রাথমিক শিক্ষা বলা হয়।

১৯৪৭-১৯৭২ সাল পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা ও দেশের সাক্ষরতার স্তর দুটিই ছিল দীর্ঘস্থায়ী জড়ত্ব ও অন্ধকারে নিমজ্জিত। ১৯৭২-৭৩ সালে ৩৬,০০০ এর অধিক সংখ্যক স্কুলের সরকারীকরণ প্রাথমিক শিক্ষা উত্থানে এক নবযুগের সূচনা বলে অভিহিত করা হয়। পরবর্তী কালে ১৯৭৪ সালের কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে উচ্চভিলাষী ও একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়। যা এ পর্যন্ত আলোর মুখ দেখেনি। ১৯৮১ সালের প্রাথমিক শিক্ষা আইনে সাবেক মহকুমা পর্যায়ে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ গঠনের প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু মূলত রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে তা ফলপ্রসূ হয়নি। ১৯৯০ সালে প্রবর্তিত বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইনে প্রয়োজনীয় আইনী এবং প্রশাসনিক ক্ষমতা লাভ করে সরকার (বাংলাপিডিয়া, ৯ম খন্ড, ২০০৩)। এরই ধারাবাহিকতায় একটি সমন্বিত রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়। এই মহতী উদ্যোগ সাধনের জন্য সরকারের সাথে বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) সম্পৃক্ত হয়। এসব প্রকল্পের আওতায় রয়েছে আনুষ্ঠানিক এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম।

গণশিক্ষার সফলতা নির্ভর করে বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রশাসনের ওপর। শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বর্তমানে ২টি প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করছে। আর এগুলো হচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় (MOE) এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ (PMED)। এমওই এবং পিএমডি- এর আওতায় ৩ ধরণের সংস্থা আছে যথা: অধিদপ্তর, পেশাগত সংস্থা এবং আধা-স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাসমূহ। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৪টি অধিদপ্তর/বিভাগ রয়েছে:

১. মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
২. কারিগরী শিক্ষা অধিদপ্তর
৩. পরিদর্শন ও অডিট অধিদপ্তর এবং
৪. ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ

এছাড়া প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের অধীনে ২টি অধিদপ্তর আছে। এগুলো হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর।

১৯৮১ সালের ১লা মার্চ সরকারের পরিকল্পনা কর্মসূচি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। এর আগে শিক্ষা অধিদপ্তর প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সমগ্র শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করত। এর প্রধান ছিলেন, ডাইরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন (DPE)। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রধান হচ্ছেন মহাপরিচালক। এর ৪টি কার্যকরী শাখা রয়েছে যথা: ১) প্রশাসনিক শাখা, ২) পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা, ৩) প্রশিক্ষণ শাখা এবং ৪) মনিটরিং এবং মূল্যায়ন শাখা। প্রতিটি শাখায় ১ জন করে পরিচালক থাকেন। এই অধিদপ্তরের বিভাগ, জেলা এবং থানা পর্যায়ে মাঠ কর্মকর্তা রয়েছে। স্কুল পর্যায়ে প্রতিটি স্কুলের জন্য ১টি করে স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি আছে। এ ছাড়া, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন কার্যক্রম তদারকি করার জন্য পিএমডি-এর অধীনে একটি পৃথক বাধ্যতামূলক শিক্ষা বাস্তবায়ন মনিটরিং ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী ১টি শীর্ষ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন এই কেন্দ্রের ওপর ন্যস্ত। এই একাডেমী পিটিআই ইনস্ট্রাকটর এবং প্রাথমিক শিক্ষার সাথে জড়িত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ ও সতেজীকরণ (Refreshers) কোর্স পরিচালনা করে থাকে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর পিএমডি-এর অধীনে আরেকটি অধিদপ্তর। এ খাতে একটি অবকাঠামো তৈরির জন্য ১৯৯১ সালে এটি সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি (INFEP) নামক একটি প্রকল্পের অধীনে কাজ করে। ইনফেপের উদ্দেশ্যসমূহ ছিল নিম্নরূপ:

১. প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি বৃদ্ধি এবং এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য ৪-৫ বছরের শিশুদের জন্য একটি বুনিয়াদী কোর্স প্রবর্তন;

২. ৬-১০ বছরের বিদ্যালয় বর্হিভূর্ত এবং ঝরে পড়া বা স্কুল-পালানো ছেলেমেয়েরা যাতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ফিরে আসে সেজন্য একটি মৌলিক কর্মসূচি প্রবর্তন;

৩. প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেনি- এ ধরনের ১১-১৪ বছরের বালক-বালিকাদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু;

৪. ১৫-৩৫ বছর ও তদূর্ধ বয়স্ক নারী-পুরুষের জন্য যুক্তিসঙ্গত সাক্ষরতা কোর্স চালু এবং সাক্ষরতা-পরবর্তী কর্মসূচি প্রণয়নের দ্বারা নব্য সাক্ষরদের জ্ঞান ও দক্ষতা সুসংহত করা। ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ (FD) প্রকৃত অর্থে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রকৌশল শাখা। ১৯৮৬ এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর দায়িত্ব হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ভবন নির্মাণ এবং সংস্কার করা।

২০০০ সালে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে সবার জন্য শিক্ষা নীতি বাস্তবায়নে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ও শিক্ষা উন্নয়ন সংক্রান্ত সংস্থাসমূহ তাদের সমন্বিত অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে। ডাকার সম্মেলনের মূল লক্ষ্যগুলো হচ্ছে:

১. সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ এবং সুযোগ-সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক ও শৈশবকালীন শিক্ষার উন্নয়ন এবং প্রসার;

২. মেয়েশিশু ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সকল শিশুর জন্য ২০১৫ সালের মধ্যে বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন;

৩. শিশু-কিশোর ও বয়স্কদের শিক্ষা চাহিদা নিশ্চিত করা;

৪. ২০১৫ সালের মধ্যে বয়স্ক সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি করা- বিশেষ করে নারীদের সাক্ষরতা শতকরা ৫০ ভাগে উন্নীত করা এবং

৫. ২০০৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় স্তরের শিক্ষা ক্ষেত্রে বিদ্যমান সকল লিঙ্গ-বৈষম্য দূর করা এবং ২০১৫ সালের মধ্যে লিঙ্গীয় সমতা অর্জনের জন্য নারীদের যথাযথ বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা।

আমরা সবাই জানি- অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের ন্যায় শিক্ষাও মানুষের মৌলিক অধিকার। এই মৌলিক অধিকার যাতে মানুষের জীবনে বাস্তবায়িত হয়, সেজন্য আমাদের ধর্মগ্রন্থসমূহেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পবিত্র হাদিসে বলা হয়েছে যে, জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রতিটি নর-নারীর জন্য ফরজ বা অবশ্যকর্তব্য। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজন বোধে সুদূর চীন দেশে যেতে বলেছেন। মুষ্টিমেয় উন্নত দেশের সব বা অধিকাংশ লোক শিক্ষিত হলেও এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অসংখ্য জনগণ শিক্ষার আলো থেকে আজও বঞ্চিত। আমাদের বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় শতকরা ৩৫ জন মানুষ সাক্ষর বলে বিবেচিত হয়- যা দেশের জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ।

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড এবং সকল উন্নয়নের চাবিকাঠি। তাই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সর্ম্পকে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। যেখানে প্রতিদিন ভোরে ওঠে তাদের খাবারের সন্ধানে ঘর ছেড়ে বের হতে হয়। সেখানে তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করানোর ভাবনা বা সময় তাদের কোথায়! তাছাড়া, দারিদ্র্যের নির্মম কষাঘাতে দরিদ্র বাবা-মা তাদের সন্তানদের পড়ালেখা করানোর জন্য বই-পত্র কেনা এবং আনুষাঙ্গিক উপকরণ সংগ্রহ করার ব্যয়ভার বহন করতে পারে না। ফলে, আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা জনগণের সার্বিক কল্যাণে নিয়োজিত হতে পারেনি। গণশিক্ষার উত্তরণের জন্য আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক, মাধ্যমিক বা অন্যান্য শিক্ষার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক ও ব্যবহারিক শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। তাই চাষ- পদ্ধতি, সবজি চাষ, হাঁস-মুরগী পালন, স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত জ্ঞান, সমবায়ের গুরুত্ব, কৃষি সমস্যাদিসহ বাস্তব জীবনের সমস্যা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করতে হবে।

গণশিক্ষা বা সাক্ষরতা অভিযানকে সফল করতে হলে আমাদের সরকার, বেসরকারী সংস্থাসমূহ তথা সমাজের বিত্তবান ও পৃষ্ঠপোষকদের এগিয়ে আসতে হবে। দেশের প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। উপযুক্ত, উচ্চ শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ শিক্ষকদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগ করতে হবে। শিক্ষকদের যথাযথ ও সময়োপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষার্থীদের শিক্ষার উপযোগী উপকরণ সরবরাহ করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধিসহ আর্থিক নিশ্চয়তা দিতে হবে। তা হলেই প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন সম্ভব হবে।

জনগণের সম্পৃক্ততা না থাকলে সকল মহতী উদ্যোগ ও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আমাদের ভাবতে হবে যে, একটু আদরের জন্য, সহানুভূতির অভাবে, দুমুঠো ভাতের অভাবে আমাদের অনেক গরীব বাবা-মায়ের শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হচ্ছে এবং অকালে ঝরে যাচ্ছে। তাই আজ শিশুদের কণ্ঠে ধ্বনিত স্লোগান- "সুযোগ চাই, মানুষ হব"-বাস্তবায়নের দায়িত্ব আমার, আপনার সবার। 'সবার জন্য শিক্ষা'এর অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে গোটা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এনজিও এবং অন্যান্য হিতৈষী সামাজিক সংগঠনগুলোর নেটওয়ার্ক ও কার্যক্রম গতিশীল ও যুগোপযোগী করতে হবে।

দেশের সার্বিক শিক্ষাব্যবস্থার সফলতা ও গুণগত মানোন্নয়ন যথাযথ প্রাথমিক শিক্ষার উৎকর্ষে ওপরে বহুলাংশে নির্ভরশীল। গণশিক্ষা বা সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে আমাদের দেশে বিদ্যমান প্রাথমিক বা বুনিয়াদী শিক্ষার উন্নয়নের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সর্বোপরি, সরকার, শিক্ষিত, বেকার এবং বিদোৎসাহী তথা সর্বস্তরের জনগণের মাঝে সচেতনতা বাড়াতে নিবিড় প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তাহলে আমরা সত্যিকার অর্থে সবার জন্য শিক্ষা বাস্তবায়নে সক্ষম হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ড. খন্দকার নেছার আহমেদ
গবেষক ও প্রাবন্ধিক

মোহাম্মদ হারুন মিয়া

কিভাবে ভালো পাঠক হওয়া যায়

ভূমিকা

বই মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দিগন্ত প্রসারিত করে। মানুষকে আলোকিত করে, মহৎ করে, তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে। তাই আলোকিত মানুষ এবং জ্ঞানী মানুষ হতে, বই পড়ার কোনো বিকল্প নেই। বই পড়ার আগে দরকার হলো ভালো পাঠক হওয়া। একজন ভালো লেখক একজন ভালো পাঠকও বটে। কারণ ভালো পাঠক না হলে, ভালো লেখক হওয়া যায় না। আর একজন লেখককে সবসময় পড়াশুনার মধ্যে থাকতে হয়। পড়াশুনা তাঁর নিত্যদিনের সহচর। একজন ভালো পাঠক কিভাবে হওয়া যায় তার কলাকৌশল সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

বিষয়বস্তু ভালো করে বুঝুন

ভালো পাঠক হতে হলে পড়াশুনার বিষয়বস্তু ভালো করে বুঝে নিতে হবে। বার বার পড়ে বিষয়টিকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনতে হবে। বিষয়বস্তুর প্রতিটি বর্ণনা, উদ্ধৃতি, উপমা, যুক্তি, ধারাবাহিকতা সব ভালো করে আত্মস্থ করতে হবে। কোনো কিছু বুঝতে না পারলে তা কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে। অজানা শব্দের অর্থ অভিধান থেকে বের করে জেনে নিতে হবে। সঠিকভাবে বুঝতে ও আয়ত্তে আনতে হলে প্রয়োজনে চিত্র, ডায়াগ্রাম, ছক, ছবি এঁকে বিষয়বস্তুকে তাতে প্রতিফলন করুন।

বিনোদনের অথবা শিক্ষা বিষয়ক কোনো কাজের জন্যই পড়ুন, যাই পড়ুন না কেন, তার মূল গঠনশৈলী ও বিষয়বস্তু উপলব্ধি করাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এসব প্রশ্ন ও অনুসন্ধিৎসু ধারণা আরো ভালো পাঠক হতে সহায়তা করে। যা পড়ছেন তা বুঝে-শুনে পড়ুন, ধারণ করুন এবং নিয়মিত পড়তে থাকুন। এভাবে পড়তে থাকলে ভালো পাঠক না হয়ে কোনো উপায় নেই।

স্মৃতিশক্তির উপর আস্থা রাখুন

যে কোনো বিষয়ের প্রতি মানুষের আস্থা থাকলে তা সহজে আয়ত্ত করা সম্ভব হয়। পড়াশুনার বেলায়ও একথা সমভাবে প্রযোজ্য। স্মৃতিশক্তিকে সবল করতে চাইলে তার প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখতে হবে। আস্থার প্রতি তাকে বিশ্বাস রাখতে হবে। স্মৃতিশক্তিকে নির্ভরযোগ্য ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য সারাক্ষণ সচেষ্ট থাকতে হবে। স্মৃতিশক্তিকে শক্তিশালী করার জন্য কিছু দিন পর পর পাঠ পর্যালোচনা করতে হবে। স্মৃতিতে আনয়ন করার জন্য বার বার স্মৃতির আয়নার উপর ভর করতে হবে। এভাবে স্মৃতিশক্তিকে প্রখর করে রাখা যেতে পারে।

যা কিছু পড়বেন তা মনে রাখুন

পড়াশুনা একটি জটিল ও কঠিন কাজ। যার যা পড়তে ভালো লাগে, তাকে তাই পড়তে হবে। শুধু পড়লেই চলবে না, এই পড়াশুনাকে মনে রাখার চেষ্টা করতে হবে, স্মৃতির পটে আনয়নের চেষ্টা করতে হবে। পড়ার সময় মনোযোগ সহকারে পড়লে যে কোনো বিষয়ই সহজে মনে রাখা সম্ভব। তাছাড়া মনে রাখার যে কৌশল আপনি সহজবোধ্য মনে করেন সেসব কৌশল অবলম্বন করুন। কাগজে, খাতায়, নোটবুক ইত্যাদিতে পড়ার বিষয় লিপিবদ্ধ করুন। নোটকৃত বিষয়গুলো মাঝে মাঝে পর পর পড়ুন। এভাবে চেষ্টা করতে থাকলে যে কোনো বিষয় মনে রাখা যাবে। সকল বয়সের পাঠকের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি উপযোগী হবে বলে আমি মনে করি।

পুরো বিষয়টি একসাথে পড়ুন

গবেষণামূলক বই, জীবনমূলক বই, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস যাই পড়ুন না কেন একসাথে, একচোটে পড়ুন। এভাবে পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন। এমনিভাবে বার বার পড়ুন। পড়ার বিষয় যদি অনেক বড় হয়, তাহলে তা ভাগ করে পড়ুন, সময় নিয়ে পড়ুন। এভাবে বই পড়ায় মনোযোগ থাকে এবং বইটি সম্পর্কে সহজে জানা যায়। একলাইন, দুইলাইন করে পড়বেন না। দুই একদিন বাদে পড়লে বই পড়ার মনোযোগ হারিয়ে যায় এবং ঠিকমত বইয়ের তথ্য ও বই সম্পর্কে জানা যায় না। একসাথে পড়লে বইয়ের পুরো বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

নোট খাতা ব্যবহার করুন

লেখালেখি একটি সুকুমার বৃত্তি, একটি অভ্যাস, একটি নেশা। নেশা ছাড়া কোনো কাজ সহজে করা যায় না। নেশায় পড়লে যে কোনো কাজ অতি সহজে করা যায় এবং এটি শেষ করার জন্য একটি স্পৃহা কাজ করে থাকে। অনেকে নেশায় মত্ত হয়ে, অনেক কঠিন কাজকে নিজের আয়ত্তে এনে সহজে করতে সক্ষম হয়। পড়ার ক্ষেত্রে বা লেখালেখির বিষয় অধ্যয়ন বা পড়াশুনা করতে হয় প্রচুর। পড়াশুনা ছাড়া লেখালেখি করা মোটেও সম্ভব নয়। তাই লিখতে গেলে পড়তে হবে, পড়তে গেলে লিখতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন হয় একটি নোট খাতার। আজকের নোট

আগামী দিনের পাথেয়। এই নোট খাতায় লিপিবদ্ধ থাকবে আপনার লেখার বিষয়বস্তু যা আপনাকে যে কোনো সময় সহায়তা করবে। লেখালেখির সময় নোট খাতা বিস্তর কাজে লাগে। কাজের অধ্যবসায়ে আগুয়ান হয়ে আপনার লেখালেখির জন্য অজানা, অচেনা, কঠিন, দুর্বোধ্য শব্দ বা বাক্য এমনকি ছন্দ থাকলে তা আপনি নোট খাতায় লিপিবদ্ধ করে রাখুন। সম্ভব হলে সাথে অভিধান খোলে অজানা শব্দের অর্থ জেনে নিন। বিষয় উল্লেখপূর্বক খাতার প্রান্তে লিখে রাখতে পারেন। এ কাজে আলাদা নোট খাতা ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারেন।

বুঝে শুনে পড়ুন

আপনি যা পড়বেন- তা বুঝে শুনে পড়ুন। বুঝে পড়লে যে কোনো বিষয়ই সহজে মনে রাখা সম্ভব। তোতাপাখির মতো বার বার পড়লে তা মনে নাও থাকতে পারে। কোনোক্রমে দুই একটি লাইন ভুলে গেলে আর সম্ভব হয় না। যা কিছু পড়বেন তার অর্থ বুঝুন, বানান জানুন, উচ্চারণ জানুন এবং প্রয়োজনে বার বার লিখুন। বার বার লিখলে তা মস্তিষ্কে অনেক দিন ধরে রাখা যায়। অর্থ মনে করতে করতে পড়ুন তাহলে সেই মুখস্থ বিষয় দীর্ঘস্থায়ী হবে।

উদঘাটিত বিষয়বস্তু লিখে রাখুন

পঠিত বইটি থেকে কি বিষয়স্তু উদঘাটন করতে সক্ষম হয়েছেন যেমন- লেখককে কোনো প্রশ্ন, বইটি নিয়ে সামগ্রিকভাবে চিন্তা, কোনো বিষয়টি সবচেয়ে ভালো লেগেছে, কোনো বিষয় দুর্বোধ্য বা বিরক্তিকর মনে হয়েছে, আপনি যা উদঘাটন করতে চেয়েছেন, গ্রন্থটি পাঠ করে আপনি তা পেয়েছেন, নাকি হতাশ হয়েছেন ইত্যাদি বিষয় উদঘাটিত হতে পারে। পরবর্তী কালে লেখকের সাথে কথোপকথন বা একান্ত আলাপচারিতায় এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করুন। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করুন। এসব বিষয় উদঘাটনের মাধ্যমে ভালো পাঠক হওয়া যায়।

সূচিপত্র পড়ুন

সূচিপত্রকে বইয়ের সংক্ষিপ্ত সিলেবাস বলা হয়। বইয়ের অভ্যন্তরে কোনো পাতায় কি আছে তার বর্ণনা দেয়া থাকে। সূচিপত্র বইয়ের বিষয়বস্তু নির্ধারণে যথেষ্ট সহায়ক। ইদানিংকালে অনেক গ্রন্থে সূচিপত্র বিস্তারিত আকারে সন্নিবেশিত হয়। ফলে বইয়ের বিষয় নির্ধারণ করতে কোনো অসুবিধা হয় না। বইটি যদি নাটক, উপন্যাস, গল্প না হয়ে কোনো সিরিয়াস বা গবেষণামূলক বই হয়, তাহলে প্রথমে বইয়ের সূচিপত্র পড়ে নেয়া ভালো। সূচিপত্রের প্রতি অধ্যায়ের শিরোনাম দেখে যেসব অধ্যায় পড়া দরকার কেবল সেগুলো পড়ুন। সবটা বইটা আপনাকে পড়তে হবে না। কৌশলে বই পড়ার কৌশল- Techniques of Technical Reading of a Book জেনে বই পড়লেও ভালো পাঠক হওয়া যায়।

পটভূমি পড়ুন

প্রতিটি বইয়েই লেখক কর্তৃক প্রদত্ত পটভূমি থাকে। পটভূমি বইয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোনো বিষয়কে সহজে বুঝার জন্য পটভূমি পড়তে হয়। যাতে বইয়ের পরিচিতি, লেখক কি উদ্দেশ্যে বইটি লিখেছেন, কোন রেফারেন্স বা উৎস ব্যবহার করেছেন, কোন প্রতিষ্ঠান থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছেন ইত্যাদি জানিয়ে দেন। এছাড়াও বইয়ের পটভূমিতে লেখকের আলাদা কিছু বক্তব্য উপস্থাপিত হয়।

পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন

বই পড়া একটি নেশা, একটি মজাদার নেশা। যে কোনো কাজেরই একটি নেশা থাকে। নেশা ছাড়া কোনো কাজ সহজে করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জ্ঞানতাপস ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ একদিন বই পড়ার নেশায় এমনি মত্ত হয়েছিলেন যে, তাঁকে কখন লাইব্রেরির কর্মীরা লাইব্রেরিতে আটকিয়ে চলে গেলেন তিনি টের পাননি। তাইতো বলা হয়ে থাকে- A book lover never goes to bed alone.

জ্যাকেট পড়ুন

বইয়ের উভয় ফ্যাপ প্রতিটি পাঠকেরই পড়া উচিত। বইটি লেখার উদ্দেশ্য এবং লেখকের কিছু বিবরণ ফ্ল্যাপে অন্তর্ভুক্ত থাকে। এছাড়াও লেখকের শিক্ষাগত যোগ্যতা, পারিবারিক বিবরণ, লেখকের অনুসন্ধিৎসু মনের অজানা কথা, লেখক কোনো বিষয়ের উপর লেখাপড়া করেছেন, কোনো বিষয়ে তিনি উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেছেন, কিভাবে বইটি লিখলেন, কেন লিখলেন, তিনি কতগুলো বইয়ের রচয়িতা, লেখকের বর্তমান অবস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে ফ্ল্যাপে লিপিবদ্ধ করেন। তাই বইয়ের ফ্ল্যাপ পড়ে বই সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করে ভালো পাঠক হওয়া যায়।

পাঠের রেকর্ড রাখুন

ভালো পাঠক হওয়ার আরেকটি শর্ত হলো, বই পাঠের রেকর্ড রাখা। পাঠ বিবরণী তৈরি করুন। কোন বইটি পড়া হয়েছে, কোন লেখকের বই পড়া হয়েছে, বই পড়ে কি তথ্য উদঘাটন করা হয়েছে ইত্যাদিও রেকর্ড রাখা প্রয়োজন। বই পাঠের রেকর্ড রাখলে একই লেখকের কতগুলো বই এবং একই বিষয়ের কতগুলো বই বা অন্য বিষয়ের কতগুলো বই পড়া হয়েছে তা সহজেই জানা যায়। পঠিত বইয়ের একটি তালিকা তৈরি করে রাখলে আরো ভালো হয়। লেখালেখিতে এ তালিকা বিস্তর উপকারে আসে এবং পরবর্তী কালে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

প্রয়াত কথাসাহিত্যিক হুমায়ুন আহমদের মতে- একজন মানুষের বয়স যদি ষাট বছর হয় আর তিনি যদি তাঁর জন্মের দিন থেকে প্রতিদিন একটি করে বই পাঠ করেন, তাহলে পাঠকের এক

জীবনে অর্থাৎ ষাট বছরে একুশ হাজার ছয়শতটি বই পাঠ করতে পারবেন কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে একজন পাঠক দশ হাজার বইও পাঠ করতে পারেন না। উপন্যাসের নায়কের মতো বলতে ইচ্ছে করে- জীবন এতো ছোট কেন? (তথ্যসূত্র: *নিউ ইর্য়কের নীলাকাশে ঝকঝকে রোদ*, হুমায়ুন আহমেদ, অন্য প্রকাশ, ঢাকা: পৃষ্ঠা-৬২)।

সমালোচনা করুন

লিখতে গেলে পড়তে হয় এটি একটি স্বাভাবিক প্রত্যয়। ভালো লেখককে ভালো পাঠকও হতে হয়। তা না হলে গন্তব্যে পৌঁছানো যায় না। একজন ভালো পাঠক কিন্তু ভালো সমালোচকও বটে। সমালোচনা একটি বইয়ের প্রকৃত পরিচয় বহন করে। বইটি ভালো কি মন্দ, বইটিতে কোনো ঘাটতি আছে কি না, আরো কিছু সংযোজন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন করা উচিত ছিলো কি না ইত্যাদি বিষয় সমালোচনার মাধ্যমে বেরিয়ে আসে। তাছাড়া পুস্তক সমালোচনা পরবর্তী কালে লেখককে আরো প্রাণবন্তভাবে বই লিখতে উৎসাহিত করে।

অভিধান ব্যবহার করুন

পাঠকমাত্র বই পড়ার প্রতি আগ্রহ থাকতে হবে। আগ্রহ না থাকলে ভালো পাঠক হওয়া যায় না। লেখকের লেখা বই বা অন্যান্য প্রবন্ধ, উপন্যাস পড়তে গেলে হয়তো দেখা যাবে লেখক যে শব্দ বা শব্দ ভাণ্ডার ব্যবহার করেছেন তা পাঠকের অজানা। অজানা থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। অজানা শব্দটি জানার জন্য বা সমস্যা কাটিয়ে উঠার জন্য অজানা, অচেনা শব্দের বানান, উচ্চারণ এবং অর্থ জানা বিশেষ প্রয়োজন। তাই হাতের কাছে একটি সর্বশেষ সংস্করণের অভিধান থাকা জরুরি। পাঠকে অর্থবহ ও উজ্জ্বল করতে অভিধানের ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই।

উৎস সম্পর্কে জানুন

লেখালেখি সহজ জিনিস নয়। লেখালেখি করতে গেলে পড়াশুনা করতে হয়। পড়াশুনা লেখকের লেখার খোরাক। কোনো প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, রম্য রচনা, গবেষণামূলক প্রবন্ধ, জীবন, ভ্রমণকাহিনী, হাসির গল্প, প্রেম-ভালোবাসা যাই লিখুন না কেন তাতে সিনিয়র লেখকদের অনুসরণ করা উচিত। এতে লেখার গতি বাড়বে, ভাষা প্রাঞ্জল ও সহজ হবে। পড়াশুনার মাধ্যমে লেখক তাঁর লেখায় কি কি উৎস ব্যবহার করেছেন, বইটি কোন প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হয়েছে অর্থাৎ বইটি সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। প্রয়োজনে এসব উৎসের অনুসরণ করা যায়। শুধু তাই নয় লেখকের ব্যবহৃত উৎস, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, চিন্তা-চেতনা, গবেষণা, কল্পনা, তাঁর সময়কার জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, পর্যবেক্ষণ, ঐতিহাসিক ঘটনা ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায়। এসব উৎস যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে লেখক বিশ্বাসযোগ্য একটি সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি করতে পারেন।

মূল বিষয় বিন্যস্তকরণ

পঠিত বইটিতে মূল বিষয় কিভাবে বিন্যস্ত হয়েছে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। সেখানে কি কোনো বিভাজন, অধ্যায়, অংক বা দৃশ্য আছে? সে সব বিভাজন বা অধ্যায়ের শিরোনাম পড়েছে কি? সেগুলো থেকে আপনি কি বুঝলেন? লেখকের মূল বিষয় কিংবা বক্তব্য, গুরুত্বপূর্ণ শব্দ, চিত্রকল্প ও ধারণাসমূহ চিহ্নিত করুন। এই বিষয়গুলো আয়ত্ত ও পড়াশুনার মাধ্যমে একজন ভালো লেখক হওয়া যায়।

লেখকের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানুন

যে কোনো বিষয়েই যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। লেখালেখিতে যোগ্যতা আরো বেশি প্রয়োজন। লিখতে লিখতেই লেখক হওয়া যায় কথাটি সত্যি, কিন্তু গবেষণামূলক লেখা, তথ্যবহুল লেখা বা যে কোনো লেখার জন্য প্রয়োজন লেখকের শিক্ষাগতযোগ্যতা। শিক্ষাগতযোগ্য ভালো হলে লেখালেখিও ভালো হয়। কারণ এক এক লেখক এক এক বিষয়ে পারদর্শী। যিনি যে বিষয়ে পারদর্শী তিনি সেই বিষয়েই লেখালেখি করবেন এটিই স্বাভাবিক। তাছাড়া বিষয়ভিত্তিক লেখালেখিতে আলাদা মজা রয়েছে। এসব বিষয় নিয়মিত অধ্যয়ন করলে ভালো পাঠক না হয়ে কোনো উপায় নেই।

শিরোনাম পড়ুন

একটি বইকে ভালোভাবে জানতে হলে বইয়ের শিরোনাম ভালো করে পড়তে হবে। শিরোনাম বইয়ের বিষয়বস্তু নির্দেশ করে, শিরোনাম বইয়ের পরিচয় বহন করে। কাজেই ভালো পাঠক হতে হলে লেখক কর্তৃক নির্বাচিত বইয়ের শিরোনাম ভালো করে পড়তে হবে। বর্তমান পাঠক ভবিষ্যতে হয়তো লেখকও হতে পারেন। একটি সুন্দর নাম সবসময়ই সুন্দর। গোলাপকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন তার সৌন্দর্য্য ও গন্ধ সে ছড়াবে। তাছাড়া মানুষ সব সময়ই সুন্দরের পূজারী। তাই বইয়েরও একটি সুন্দর নাম বা শিরোনাম থাকা বাঞ্ছনীয়। শিরোনামের উপর নির্ভর করে বইয়ের পরিচিতি, বইয়ের বিষয়বস্তু। ভালো পাঠক হওয়া যেমন ভাগ্যের ব্যাপার, তেমনি ভালো লেখক হওয়া আরো বেশি ভাগ্যের ব্যাপার।

উপসংহার

পড়ার বিষয়টি চিরন্তন। পাঠ অভ্যাস ছাড়া জ্ঞান অর্জন কোনো কালেই সম্ভব নয়। জ্ঞান অর্জনের প্রধান মাধ্যম হলো বই। বই মেধা ও মনন বিকাশে সব সময় সহায়তা করে আসছে, করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। তাই জ্ঞান অর্জনের জন্য বেশি করে বই পড়ুন। বই পড়ুন, বই পড়ুন এবং বই পড়ুন।

মোহাম্মদ হারুন মিয়া
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

সাক্ষরতার হার নিয়ে বিভ্রান্তি

দেশে সাক্ষরতার হার নিয়ে রয়েছে অনেক বিভ্রান্তি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) বলছে, সাক্ষরতার হার ৫৯ দশমিক ৮২ শতাংশ। আর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে, সাক্ষরতার হার ৬৫ শতাংশ। অন্যদিকে বেসরকারি সংস্থাগুলোর (এনজিও) মোর্চা গণসাক্ষরতা অভিযানের তথ্যানুযায়ী, সাক্ষরতার হার ৫৮ ভাগ। সাক্ষরতার হার নিয়ে বিভ্রান্তি থাকায় প্রকৃত নিরক্ষর সংখ্যা নিয়েও তৈরি হয়েছে বিভ্রান্তি। পঞ্চম আদমশুমারি অনুযায়ী, বর্তমানে দেশের জনসংখ্যা ১৫ কোটি ২৫ লাখ ১৮ হাজার ১৫ জন। সাক্ষরতার হার ৬৫ শতাংশ হলে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫ কোটি ৩৩ লাখ ৪১ হাজার। কিন্তু সরকারিভাবে দেশে প্রায় ২ কোটি ৫০ লাখ মানুষ নিরক্ষর বলা হয়েছে। এদিকে ইউএনডিপির সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুসারে, বাংলাদেশে প্রাপ্তবয়স্ক নিরক্ষর জনগোষ্ঠী হচ্ছে ৫৭ শতাংশ। আর অ্যাসেসমেন্ট সার্ভে নামের আরেকটি সংস্থার পরিসংখ্যান মতে, নিরক্ষরতার হার ৫১ দশমিক ৩ শতাংশ। এখানেও নিরক্ষরদের বয়স ১৫ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে। সরকারি ও বেসরকারি তথ্যে এ অমিলের মধ্যেই আজ ৮ সেপ্টেম্বর বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে রবিবার সচিবালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, দেশে এখন সাক্ষরতার হার ৬৫ শতাংশ। সে অনুযায়ী নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা আড়াই কোটি। মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী আখতার হোসেন বলেন, সাক্ষরতার হার ৬৫ শতাংশের বেশি হতে পারে। নাম লিখতে পারলেই সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন– আমরা এ ধারণা থেকে বেরিয়ে এসেছি। দেশে বর্তমানে সাক্ষরতার হার ৭০ শতাংশের কাছাকাছি পৌঁছেছে বলেও আমার বিশ্বাস।

আজ ঢাকায় আন্তর্জাতিক সম্মেলন: 'টেকসই উন্নয়নের মূল কথা সাক্ষরতা আর দক্ষতা' স্লোগান নিয়ে আজ সাক্ষরতা দিবসে রাজধানীতে আয়োজন করা হয়েছে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন। এ সম্মেলনে অংশ নেবেন ৩৬টি দেশের প্রতিনিধিরা। রবিবার এক সংবাদ সম্মেলনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান জানান, শিক্ষা ও সাক্ষরতার মাধ্যমে বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের সাফল্য এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্জিত কৃতিত্বের বিষয়গুলো এ সম্মেলনে তুলে ধরা হবে। ১৯৬৫ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো ৮ সেপ্টেম্বরকে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ঘোষণা করে। এর পর থেকে প্রতি বছর বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এ দিবস পালন করে আসছে। আজ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'গার্লস অ্যান্ড উইমেন্স লিটারেসি অ্যান্ড এডুকেশন। ফাউনডেশন্স ফর সাসটেইন্যাবল ডেভেলপমেন্ট' শীর্ষক এ সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ অনুষ্ঠানে ১৪টি দেশের প্রতিনিধিদের হাতে ইউনেস্কো লিটারেসি অ্যাওয়ার্ড তুলে দেবেন।

আলোকিত বাংলাদেশ ৮.০৯.২০১৪

অনিশ্চয়তায় আদিবাসীদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা

পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সমতলের পাঁচটি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর শিশুদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করার সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। বাজেট প্রাপ্তিতে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, প্রস্তুতিমূলক কাজে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সমন্বয়হীনতার কারণে এ অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানিয়েছেন।

এদিকে মাতৃভাষায় শিক্ষা কার্যক্রম চালু করাসহ পাঁচ দফা দাবিতে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) গতকাল রবিবার বেলা ১১টায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। পিসিপি খাগড়াছরি সরকারি কলেজ শাখার উদ্যোগে খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা পরিষদ কার্যালয় এলাকা থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে চেঙ্গী স্কয়ারে এসে সমাবেশ করে। সমাবেশে বক্তব্য দেন জেসীম চাকমা, এলটন চাকমা, সুনীল ত্রিপুরা ও রিয়েল ত্রিপুরা।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও এনসিটিবির কর্মকর্তারা জানান, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ছয়টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সাঁওতাল ভাষার বর্ণমালা নিয়ে সমস্যা থাকায় বহুভাষিক শিক্ষাক্রম (এমএলই) পদ্ধতিতে পাঁচটি জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের সিদ্ধান্ত হয়। এর মধ্যে রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা এবং সমতল অঞ্চলের গারো ও সাদ্রি ভাষা।

এমএলই পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য এমএলই নিয়ে গবেষণা, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, আদিবাসী শিশুদের পরিচিত জগতের শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরির কথা এনসিটিবির। আর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে পাঠ্যপুস্তকের চাহিদাপত্র ও কোথায় কোন আদিবাসীর বসবাস রয়েছে উল্লেখ করে জনমিতিক মানচিত্র তৈরি, শিক্ষক প্রশিক্ষক এবং বিদ্যালয়ে আদিবাসী শিশুদের পাঠদানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এনসিটিবি ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মধ্যে কোনো সমন্বয় না থাকায় বাস্তবে এখনো কোনো কাজ হয়নি। অথচ ২০১৫ সালের জানুয়ারি থেকে এমএলই চালু করার কথা রয়েছে।

এনসিটিবির কর্মকর্তারা বলেছেন, এমএলই কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিমূলক কাজের জন্য ৯৬ লাখ টাকা বাজেট চাওয়া হয়েছে। বাজেট অনুমোদন হলেও আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে এখনো তা এনসিটিবিতে এসে পৌঁছায়নি। এ জন্য সব কাজ স্থবির হয়ে রয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সঙ্গে এনসিটিবির সমন্বয়হীনতা রয়েছে স্বীকার করে ওই গবেষণা কর্মকর্তা বলেন, পাঠ্যক্রম তৈরির দায়িত্ব এনসিটিবির হলেও এটি বাস্তবায়নের কাজ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের। কিন্তু অধিদপ্তর থেকে এ পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকের চাহিদাপত্র প্রদান, প্রশিক্ষণের জন্য শিক্ষকের তালিকা দেওয়া ও জনমিতিক মানচিত্র তৈরিসহ কোনো ব্যাপারে এনসিটিবির সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়নি। এ অবস্থায় এনসিটিবি পাঠ্যপুস্তকের কাজ ডিসেম্বরে শেষ করলেও জানুয়ারি থেকে আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা চালু নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) রুহুল আমিন ও পরিচালক (নীতি নির্ধারণ ও মনিটরিং) মোহাম্মদ ইমরান বলেন, এ ব্যাপারে এনসিটিবি থেকে তাঁদের কোনো কিছু জানানো হয়নি।

অধিদপ্তরের শিক্ষা কর্মকর্তা (সামগ্রিক শিক্ষা) মজিবুর রহমান বলেন, এনসিটিবির পরবর্তী ধাপে অধিদপ্তরের কর্মসূচি বাস্তবায়নের কথা রয়েছে। এ জন্য এনসিটিবি পাঠ্যপুস্তক, প্রশিক্ষণ মডিউল ও প্রশিক্ষিত শিক্ষক না দিলে তাঁদের করার কিছু নেই।

প্রথম আলো ১৫.০৯.২০১৪

স্কুল নদীতে, গাছতলায় লেখাপড়া

কয়েকদিন আগেও যে স্কুলের বিশাল মাঠে ছাত্রছাত্রীরা হা-ডু-ডু ফুটবল আর ছি বুড়ি খেলত, যে কক্ষে বসে শিক্ষাগ্রহণের অনুকূল পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণ করত, আর তা কেবলই স্মৃতি হয়ে গেছে। ব্রহ্মপুত্র নদের করাল গ্রাসে স্কুলভবন আর স্কুল মাঠটি আজ নদীতে বিলীন। তারপরও পাঠদান বন্ধ নেই, থেমে নেই স্কুল। বর্তমানে ছাত্রছাত্রীরা প্রতিকূল পরিবেশে খোলা আকাশের নিচে, অন্যের উঠানে ক্লাস করছে।

উপজেলার অষ্টমীর চর ইউনিয়নে গিয়ে দেখা গেছে এই দৃশ্য। ঘাটপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি নদীতে বিলীন হয়ে যাওয়ায় এলাকাবাসী ও শিক্ষকদের চেষ্টায় বিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী হাবিবুর রহমানের বাড়ির উঠানে গাছ বাগানে খোলা আকাশের নিচে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ১৯০ ছাত্রছাত্রীকে পাঠদান দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে সেখানে দুর্গন্ধময় পরিবেশে শিশুদের পাঠদান চলছে। চারদিকে রয়েছে কাদাপানি। শুধু তাই নয়, শিশু শিক্ষার্থীদের কোমরপানি ভেঙ্গে জীবনের ঝুঁকি

নিয়ে স্কুলে আসতে হচ্ছে।

পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী সুমিনা খাতুন ও ছাত্র জাহিদ হাসান জানান, সামনে আমাদের পিএসসি পরীক্ষা, কিন্তু ঠিকমতো ক্লাস হচ্ছে না। আমরা পড়ালেখায় পিছিয়ে যাচ্ছি। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আ. সাত্তার প্রামাণিক জানান, যখন থেকে বিদ্যালয়টি নদীভাঙনের হুমকির মধ্যে পড়েছে, তখন থেকেই প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষে কাছে আবেদন করে আসছি। শেষ পর্যন্ত তা নদীতে ভেসে গেল। কিন্তু এখন পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ কোনো নজর দেয়নি। উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা আ. হামিদ বলেন, আমরা চেষ্টা করছি দ্রুত এর সমাধান করার।

সমকাল ২১.০৯.২০১৪

ভাড়া করা ভবনে আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়

ভাড়া করা ভবনে আর কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন দেবে না সরকার। নতুন স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করতে গেলে এখন থেকে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জমি থাকতে হবে। এ জন্য একটি নীতিমালা তৈরি করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রস্তাবিত এ নীতিমালায়, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য দশমিক ২০ একর, পৌর এলাকায় দশমিক ৩০ একর এবং মফস্বল এলাকায় দশমিক ৪০ একর জমি থাকার শর্ত আরোপ করা হচ্ছে। আর মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে শহরাঞ্চলে দশমিক ২৫ একর এবং গ্রামাঞ্চলে দশমিক ৫০ একর জমি থাকতে হবে।

অন্যদিকে মাদ্রাসার ক্ষেত্রে শহর ও গ্রমাঞ্চলে যথাক্রমে দশমিক ৪৫ একর ও ৬০ একর, এসএমসি, ভোকেশনাল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে শহর ও গ্রামে যথাক্রমে দশমিক ১৫ ও দশমিক ৩০ একর জমি থাকার কথা বলা হয়েছে। এসব জমি হতে হবে অখণ্ড ও বিদ্যালয়ের নামে। নতুন নীতিমালায় মেট্রোপলিট্রন ও সিটি করপোরেশন এলাকায় ভাড়া করা ভবনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যাপারে ব্যাপক কড়াকড়ি আরোপ করা হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জনা গেছে।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে শিক্ষা সচিব ড. মোহাম্মদ সাদিক সমকালকে বলেন, 'সময়ের তাগিদেই বিদ্যমান নীতিমালায় সংশোধন ও হালনাগাদকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। বর্তমান নীতিমালার পরিবর্তে আমরা একটি যৌক্তিক ও কার্যকর নীতিমালা করতে চাই। সুন্দর নীতিমালার জন্য একটি কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়েছিল। তারা একটি খসড়া সুপারিশমালা দাখিল করেছে। এখন এর ওপর কমিটির সদস্যসহ অন্যান্য অংশীজন মতামত দেবেন। এর পরই তা চূড়ান্ত করা হবে।

জানা গেছে, বর্তমান নীতিমালায়ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে নিজস্ব জমি থাকার কথা বলা আছে। তবে তাতে ভাড়া করা ভবনেও প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। এ ছাড়া ভাড়া বাড়িতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনেরও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। শিক্ষাসংশ্লিষ্ট অনেকে বলেছেন, প্রস্তাবিত এ নীতিমালা বাস্তবসম্মত নয়। কারণ, এ নীতিমালা বাস্তবায়িত হলে কেবল শিক্ষা ব্যবসায়ীরাই মোটা অঙ্কের অর্থ বিনিয়োগ করে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। সাধারণ মানুষ আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে আগ্রহী হবেন না। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি মো. নজরুল ইসলাম রনি সমকালকে বলেন, জমির দাম যেভাবে বাড়ছে, তাতে বিভিন্ন এলাকার বিদ্যোৎসাহী সাধারণ মানুষের পক্ষে আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়ে উঠবে না।

জানা গেছে, বর্তমানে ১৯৯৭ সালের নীতিমালা অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমোদন দেওয়া হয়। এটিকে সংশোধন করে 'বেসরকারি উদ্যোগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা) স্থাপন, চালুকরণ ও স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নীতিমালা নামে নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করা হচ্ছে। এ নীতিমালা চূড়ান্ত করতে গত ১৮ আগস্ট শিক্ষা সচিব ড. মোহাম্মদ সাদিকের সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) এবং বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। শিগগিরই ওই কমিটি আরেক দফা সভা করবে।

প্রস্তাবিত নীতিমালায় বলা হয়েছে, নতুন অনুমোদনের জন্য বিদ্যালয়ের নামে নামজারিকৃত জমিতে নিজস্ব ভবন থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে ছাত্রপ্রতি ন্যূনতম এক বর্গমিটার হিসেবে মোট এক হাজার বর্গমিটারের ভবন হতে হবে। আর ভবনে প্রধান শিক্ষকের কক্ষ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পৃথক কমনরুম, পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষ, লাইব্রেরি, অফিস, কম্পিউটার ল্যাবরেটরি, ছেলে ও মেয়েদের পৃথক টয়লেট ও সুপেয় পানির ব্যবস্থা, বিজ্ঞানাগার থাকা আবশ্যক করা হয়েছে। প্রতি কক্ষের আয়তন সর্বনিম্ন ২৪ বর্গমিটার ও সর্বোচ্চ ৩০ বর্গমিটার রাখারও প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের নামে সাধারণ ও সংরক্ষিত-দুই ধরনের তহবিল থাকতে হবে। এর মধ্যে নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এক লাখ টাকা করে মোট দুই লাখ টাকা, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দুই লাখ টাকা করে মোট চার লাখ টাকা এবং উচ্চ মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তিন লাখ করে ছয় লাখ টাকার তহবিল থাকতে হবে।

অবশ্য ব্যক্তির নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামকরণেরও সুযোগ রাখা হয়েছে প্রস্তাবিত বিধিমালায়। এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের নামে অর্থ জমা দিতে হবে। নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নামকরণ ব্যক্তির নামে করতে হলে কমপক্ষে ১০ লাখ টাকা এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে ১৫ লাখ করে টাকা দিতে হবে।

সমকাল ২০.০৯.২০১৪

১৭০০ স্কুল অধিগ্রহণ হলেও শিক্ষকদের ভাগ্য খোলেনি

জাতীয়করণের ঘোষণা দিয়ে বছর খানেক আগে প্রায় এক হাজার সাতশ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অধিগ্রহণ করা হয়। কিন্তু এসব বিদ্যালয়ের প্রায় আট হাজার শিক্ষকের চাকরি সরকারীকরণের কাজটি আটকে আছে আমলাতান্ত্রিক জটিলতায়। ফলে বেতন না পেয়ে তাঁদের মধ্যে হতাশা দেখা দিয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্রগুলো বলছে, এ কাজ শেষ হতে আরও কিছুদিন সময় লাগবে। তবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব কাজী আখতার হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, শিক্ষকদের হতাশ হওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রক্রিয়াগত কিছু কাজ করে শিগগিরই তাঁদের চাকরি সরকারীকরণ করে বেতন দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও অধিগ্রহণ হওয়া বিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী প্রথম ধাপে প্রায় ২৩ হাজার নিবন্ধনকৃত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণের পর গত বছরের অক্টোবরে দ্বিতীয় ধাপে আরও প্রায় এক হাজার সাতশ' বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের জন্য অধিগ্রহণ করা হয়। আইন অনুযায়ী বিদ্যালয়ের জমি, গৃহ, নগদ তহবিলসহ যাবতীয় সম্পদ সরকারের অনুকূলে আনা হয়। তখন ওই সব বিদ্যালয়ের প্রায় আট হাজার শিক্ষকের মুখে হাসি ফোটে। তাঁদের ধারণা ছিল, বিদ্যালয় অধিগ্রহণের কিছুদিনের মধ্যে হয়তো তাঁদের চাকরিও সরকারি হয়ে যাবে।

রংপুর বিভাগের একটি জেলার এ রকম তিনজন শিক্ষক *প্রথম আলোকে* বলেন, আমরা যে বিদ্যালয়ে চাকরি করছি, সেগুলোতে আগে থেকেই সরকার থেকে বেতন-ভাতা পেতাম না। ওই ঘোষণার পর আমরা খুশি হয়ে আশায় বুক বেঁধেছিলাম। কিন্তু দীর্ঘদিনেও সেটি না হওয়ায় এখন হতাশ হয়ে গেছি। কী কারণে হচ্ছে না, তা-ও জানি না।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা বলেন, বিদ্যালয়গুলো অধিগ্রহণের পর এখন সরকারি নিয়মে পদ সৃষ্টি করে সেগুলোর বিপরীতে বিদ্যমান শিক্ষকদেররই নিয়োগ দেওয়ার কাজ চলছে। এই আনুষ্ঠানিকতা শেষ করতে আরও মাসে দুয়েক সময় লাগতে পারে।

প্রথম আলো ২২.০৯.২০১৪

শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জসমূহ: আমাদের করণীয় শীর্ষক কর্মশালা

'সবার জন্য শিক্ষা, নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গণসাক্ষরতা অভিযান অ্যাডভোকেসি ও নেটওয়ার্কিং কার্যক্রমের পাশাপাশি সবার জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্তকরণ, বিদ্যালয়ে শিখন-

শেখানো প্রক্রিয়াসহ সামগ্রিক পরিবেশ উন্নয়নে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এসএমসি, পিটিএ, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দসহ শিক্ষক ও স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে শ্রেণিকক্ষে আনন্দদায়ক ও ফলপ্রসু শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা এবং স্থানীয় পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি করাই এ সকল উদ্যোগের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জসমূহ: আমাদের করণীয় শীর্ষক কর্মশালাসমূহ গণসাক্ষরতা অভিযান ও এর সহযোগী সংস্থা মানব উন্নয়ন কেন্দ্র, মেহেরপুর, সোসিও-ইকোনমিক এন্ড রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট এসোসিয়েশন, নেত্রকোনা এবং ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, সিরাজগঞ্জ-এর যৌথ আয়োজনে আগস্ট ২০১৪-এ অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালাসমূহে শিক্ষক, এসএমসি-র সদস্য, শিক্ষক-অভিভাবক সদস্য, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যসহ মোট ১৫৩ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সংশ্লিষ্ট এলাকার জেলা প্রথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, সহকারি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, পিটিআই ইন্সট্রাক্টর, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা প্রমুখ উপযুক্ত কর্মশালাগুলোর অধিবেশন পরিচালনা করেন।

জামিল মুস্তাক

কেমন বই চাই

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মতামত সংগ্রহের লক্ষ্যে ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও এর সহযোগী সংগঠন সেরা-র উদ্যোগে নেত্রকোণা জেলার পূর্বধলা উপজেলার আগিয়া উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে 'কেমন বই চাই' শীর্ষক বিদ্যালয়ভিত্তিক ক্যাম্পেইন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত এই ক্যাম্পেইন কর্মসূচিতে আগিয়া উচ্চ বিদ্যালয় ও আগিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। নানাবিধ কার্যক্রমের মধ্যদিয়ে উৎসবমুখর পরিবেশে সারাদিনের কার্যক্রম তিনটি পর্বে বিভক্ত করা হয়েছিল। প্রথমাংশে অনুষ্ঠিত দলীয় কাজে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীর মোট একশ শিক্ষার্থী সরাসরি পাঠ্যবই ও অন্যান্য সহায়ক উপকরণ সম্পর্কে তাদের মতামত জানায়। শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষকগণও পাঠ্যপুস্তক এবং বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ সম্পর্কে তাদের মতামত প্রদান করেন।

দ্বিতীয় ভাগে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় শিক্ষার্থীরা দলীয় কাজের মধ্যদিয়ে প্রাপ্ত মতামতসমূহের সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করে। শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে এভারেস্ট বিজয়ী পর্বতারোহী এম. এ. মুহিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান হোসনে আরা আক্তার (লুৎফা), জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মালবিকা ভৌমিক, আগিয়া কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি আজিজুর রহমান তালুকদার। আগিয়া ইউপি চেয়ারম্যান সানোয়ার হোসেন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সংক্ষেপে তুলে ধরেন গণসাক্ষরতা অভিযানের কার্যক্রম ব্যবস্থাপক মো. মোস্তাফিজুর রহমান। আরো উপস্থিত ছিলেন শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক,

শিক্ষাবিদ, সরকারি কর্মকর্তা, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, এনজিও এবং গণমাধ্যম প্রতিনিধিবৃন্দ। দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের শেষভাগে পূর্বধলা উপজেলা শিল্পকলা একাডেমীর পরিবেশনায় অনুষ্ঠিত হয় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

সান্ত্বনা আইউব

আনন্দময় ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন

শিশুরা আনন্দপ্রিয়, অনুসন্ধিৎসু এবং কৌতুহলী। সে কারণে বিদ্যালয়ে শিখন শেখনো কর্যক্রমে আনন্দময়

পরিবেশ সৃস্টি করা না গেলে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন সম্ভব নয়। শিশুর এই মানসিক অবস্থা বিবেচনায় রেখে আনন্দদায়ক পদ্ধতিতে পাঠদান সর্বজন স্বীকৃত একটি প্রক্রিয়া। শিখন তখনই সহজ, বোধগম্য ও আকর্ষণীয় হয় যখন এর মধ্যে আনন্দের পরিবেশ অনুভুত হয়।

এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গণসাক্ষরতা অভিযান সহযোগী ৮টি এনজিও-র মাধ্যমে ৩২টি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এলাকায় পর্যায়ক্রমে আনন্দময় ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন পরিচালনা করে আসছে। এ উদ্যোগের আওতায় মেহেরপুর, খুলনা, গাইবান্ধা, জামালপুর ও ভোলা জেলায় সেপ্টেম্বর মাসে আনন্দময় ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন বিষয়ক ৮ ব্যাচ ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়।

ওরিয়েন্টেশনসমূহে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, এসএমসি-র সদস্য, শিক্ষক-অবিভাবক কমিটির সদস্য, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যসহ মোট ২৬০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। ওরিয়েন্টেশনসমূহে অধিবেশন পরিচালনা করেন সংশ্লিষ্ট এলাকার জেলা প্রথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, সহকারি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, পিটিআই ইন্সট্রাক্টর, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও স্থানীয় সংস্থার প্রশিক্ষকবৃন্দ।

জামিল মুস্তাক

কাউন্সিল সভা

১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪ শনিবার গণসাক্ষরতা অভিযান-এর সম্মেলন কক্ষে অভিযান-এর কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অভিযান কাউন্সিলের চেয়ারপার্সন ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-এর সভাপতি কাজী রফিকুল আলম। এছাড়া উপস্থিত অন্যান্য সদস্যগণ হলেন: ড. মনজুর আহমদ, আরমা দত্ত, জ্যোতি এফ গমেজ, শিশির এনজেলও রোজারিও, ম. হাবিবুর রহমান, জাকী হাসান, গোলাম মোস্তফা দুলাল, কুমার প্রীতিশ বল, মাহবুবল ইসলাম, ড. মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া, পবন রিচিল, শামীমা লাইজু নীলা, মথুরা ত্রিপুরা এবং রাশেদা কে. চৌধুরী।

সভার আলোচ্যসূচি ছিল

১. বিগত ১৭ এপ্রিল ২০১৪ অনুষ্ঠিত কাউন্সিল সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন ও ফলোআপ;

২. অভিযান-এর চলমান প্রকল্পসমূহের কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

৩.অভিযানের সংশোধিত Financial and Administrative Policy ও Human Resource Policy অনুমোদন;

৪. SRHR প্রকল্পের জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৪ সময়ের বাজেট এবং অডিটর নিয়োগ অনুমোদন;

৫. CSEF প্রকল্পের অডিটর নিয়োগ অনুমোদন;

৬. অভিযান-এর Gratuity Fund নিবন্ধন সংক্রান্ত আলোচনা ও প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

৭. বিবিধ

উপর্যুক্ত অলোচ্যসূচির ওপর সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয় ও সর্বসম্মতিক্রমে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়। এছাড়া জ্যোতি এফ গমেজ কারিতাস বাংলাদেশ থেকে অবসর গ্রহণ করার কারণে গণসাক্ষরতা অভিযান-এর কাউন্সিলে তাঁর সদস্যপদ শেষ হয়েছে। তাঁর স্থলে কারিতাসের মনোনীত শিশির রোজারিও সভায় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া জ্যোতি এফ গমেজ-এর অবর্তমানে অভিযান কাউন্সিলের কোষাধ্যক্ষ পদটি পূরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে কাউন্সিল সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেভ দ্য চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনাল-এর প্রতিনিধি ম. হাবিবুর রহমানকে অভিযান কাউন্সিলে কোষাধ্যক্ষ পদে মনোনীত করা হয়।

জয়া সরকার

বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০১৪ উদযাপন বিষয়ক পরিকল্পনা সভা

গণসাক্ষরতা অভিযান প্রতি বছরের ন্যায় এবারো বিশ্ব শিক্ষক দিবস উদযাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ উপলক্ষে ২৪ সেপ্টেম্বর গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রশিক্ষণ কক্ষে একটি পরিকল্পনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন, সিভিল সোসাইটি প্রতিনিধি, বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের প্রতিনিধিসহ প্রায় ৯০ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন মুস্তাফিজুর রহমান খান, নির্বাহী পরিচালক, স্ব-উন্নয়ন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন গণসাক্ষরতা অভিযানের কার্যক্রম ব্যবস্থাপক মোস্তাফিজুর রহমান।

পরিকল্পনা সভার শুরুতেই এবারের বিশ্ব শিক্ষক দিবস ঈদ এবং পূজার ছুটির মধ্যে হওয়ায় সকলের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯ থেকে ২২ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০১৪৪' উদযাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এছাড়া সভায় বিশ্ব শিক্ষক দিবসের প্রতিপাদ্য, কার্যক্রমের রূপরেখা, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের কর্মসূচি, পত্রিকায় প্রকাশিতব্য গণআহ্বান সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং মতামত গ্রহণ করা হয়। সভায় এবারের প্রতিপাদ্যের বাংলা অনুবাদ করা হয়, শিক্ষকের জন্য বিনিয়োগ, ভবিষ্যতের বিনিয়োগ।

২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে সহযোগী সংগঠনের প্রতিনিধি যারা মাঠ পর্যায়ে দিবসটি গণসাক্ষরতা অভিযানের সহায়তায় উদযাপন করবেন তাদের নিয়ে একটি পরিকল্পনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সহযোগী সংগঠনের ৩০ জনপ্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

ফারদানা আলম সোমা

সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে তথ্য অধিকার আইন শীর্ষক মতবিনিময় সভা

শিক্ষা বিষয়ক তথ্য ও সেবাসমূহ জনগণের কাছে সহজলভ্য করা ও শিক্ষায় সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য 'তথ্য অধিকার আইন' কিভাবে সহযোগিতা করতে পারে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অবহিত করা এবং তাদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করার লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে আয়োজন করা হলো সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে তথ্য অধিকার আইন শীর্ষক দুইটি মতবিনিময় সভা।

১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখ ঝিনাইদহ জেলায় সহযোগী সংগঠন এইড-এর সাথে যৌথ উদ্যোগে এবং ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখ নরসিংদী জেলায় সহযোগী সংস্থা এমডিএস-এর সাথে যৌথ উদ্যোগে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ঝিনাইদহ জেলায় আয়োজিত সভায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় জেলা প্রশাসক শফিকুল ইসলাম, এছাড়া অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা তথ্য কর্মকর্তা, সহকারি মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, সহকারি প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার প্রমূখ। সভায় সভাপতিত্ব করেন এন এম শাহজালাল, সরকারি নুরুন্নাহার মহিলা কলেজের অবসরপ্রাপ্ত উপাধক্ষ্য। নরসিংদী জেলায় অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নরসিংদীর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মিসেস সুরাইয়া বেগম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. শাহ নেওয়াজ খালেদ, সভায় সভাপতিত্ব করেন নরসিংদী সরকারী কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ গোলাম মোস্তফা মিয়া। সভা দুটিতে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগের/দপ্তরের প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ, শিক্ষার্থী, সুধী সমাজের প্রতিনিধি, মিডিয়া প্রতিনিধি ও বেসরকারি সংগঠন প্রতিনিধিসহ প্রায় ৭০-৮০ জন উপস্থিত ছিলেন। এই মতবিনিময় সভায় রিসোর্স পার্সন হিসেবে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন মো. রফিকুল হাসান, উপ-সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

কিভাবে স্থানীয় জনগণ তথ্য অধিকার আইন প্রদত্ত শক্তি ও সুযোগ ব্যবহার করে শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য জানতে পারে, শিক্ষার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে, স্থানীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় অংশ নিতে পারে এবং সুশাসন নিশ্চিত করতে পারে তার ওপর আলোকপাত করাই এ সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল। বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে হলে এ আইনটির প্রচার ও এর ব্যবহার সম্পর্কে জনগণকে সচেতন থাকা প্রয়োজন।

রাজশ্রী গায়েন

৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪
আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস

টেকসই উন্নয়নের মূলকথা, সাক্ষরতা আর দক্ষতা

সাক্ষরতা হল সব ধরনের শিক্ষার মূল ভিত্তি। সাক্ষরতা মানুষকে তার উন্নত জীবন ও জীবিকার জন্য প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বাড়াতে কার্যকরভাবে সাহায্য করে। মানুষের এমন দক্ষতার সঙ্গে সামাজিক উন্নয়ন সর্বতোভাবে যুক্ত।

সর্বজনীন সাক্ষরতার গুরুত্ব স্বীকার করে ১৯৬৬ সাল থেকে পৃথিবীব্যাপী 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস' পালিত হয়ে আসছে। এবারের সাক্ষরতা দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে **সাক্ষরতা ও টেকসই উন্নয়ন,** যার কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছে স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের অগণিত মানুষ।

আমরা বার বার নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার কথা বলেছি। এদেশে যখন যে সরকার ক্ষমতায় আসেন তারা নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি যে এখনো পূর্ণ হয়নি তা বলা বাহুল্য। তাই লক্ষ্য অর্জনের প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করার জন্য সরকার, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের যৌথ উদ্যোগে জনঅংশগ্রহণমূলক, সুনির্দিষ্ট, সমন্বিত কর্মসূচি দরকার। অন্যথায় টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে না।

তাই আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে আমাদের দাবি

- শিক্ষার অধিকারকে মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে
- শিক্ষানীতি ২০১০-এর সকল ধারার যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে
- সাক্ষরতা অর্জনের লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে
- সাক্ষরতা কর্মসূচিকে দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করতে হবে। এ জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে
- শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক জীবনব্যাপী শিক্ষার প্রয়োজনীয় কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। এজন্য সাক্ষরতাভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন শিক্ষার যথাযথ কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে
- স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচিতে যথাযথ পরিমার্জনের ব্যবস্থা করতে হবে
- নারী, কর্মজীবী শিশু-কিশোর, পথশিশু, চর-হাওর, দুর্গম ও বিচ্ছিন্ন এলাকার অধিবাসী, আদিবাসী, প্রতিবন্ধী, পতিতা পল্লী, অনাথ ও ভবঘুরে আশ্রয়কেন্দ্রের শিশু ও যুবসহ সকল সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে
- সাক্ষরতা এবং মানসম্মত শিক্ষা বিষয়ে অঞ্চলভিত্তিক/স্থানীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে
- সাক্ষরতা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারি উদ্যোগের সাথে দক্ষ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার অংশগ্রহণ ও সমন্বয়ের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে
- দৃঢ় প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হলেও ২০১৪ সালের মধ্যে দেশে 'সবার জন্য শিক্ষা'-র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হচ্ছে না। তাই বাস্তবতা বিবেচনায় নতুন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে এবং তার যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য সুচিন্তিত, অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে
- জাতীয় বাজেটে যুব ও বয়স্ক সাক্ষরতা এবং জীবনব্যাপী শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রাখতে হবে এবং এই বরাদ্দের যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে

সরকারী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বাংলাদেশকে একটি মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করতে হলে সাক্ষর সমাজ বিনির্মাণের কোন বিকল্প নেই। আমরা চাই সরকার 'সবার জন্য শিক্ষা'-র লক্ষ্য অর্জনে যে অঙ্গীকার করেছে তা যেনো পূরণ করা হয়।

গণসাক্ষরতা অভিযান তথ্য বিতরণ, সঞ্চালন ও কার্যক্রমের আওতায় জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের বার্তা, তথ্য, শ্লোগান ইত্যাদি *সাক্ষরতা বুলেটিন*-এ নিয়মিত ছাপানোর উদ্যোগ নিয়েছে। সরকারি, বেসরকারি সংস্থাসমূহের উন্নয়নমূলক ও মানবাধিকার সম্পর্কিত এ ধরনের বার্তা, তথ্য ও শ্লোগান বুলেটিন কার্যালয়ে পাঠানোর জন্য সকল শুভানুধ্যায়ীর কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।

সাক্ষরতা বুলেটিন

সংখ্যা ২৪৪ আশ্বিন ১৪২১ সেপ্টেম্বর ২০১৪

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস সংখ্যা

সম্পাদক

একটা সময় ছিল, যখন সাক্ষরতা কর্মসূচিকে একটা সমাজসেবামূলক উদ্যোগ বলে বিবেচনা করা হত। এমন উদ্যোগের মধ্যে আন্তরিকতার ঘাটতি ছিল না। যারা আজ থেকে ষাট-সত্তর বছর আগে এসব কাজকর্ম করতে এগিয়ে এসেছিলেন, তারা তাদের সাংগঠনিক সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তাই এলাকাভিত্তিক এসব উদ্যোগ সাক্ষরতা কার্যক্রমের ইতিহাসের অঙ্গ হলেও, বৃহত্তর জাতীয় ক্ষেত্রে তা কোন সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে, এমন আশায় তারা উত্তেজিত ছিলেন না।

কালপরিক্রমায় সমাজে এ ধরনের একটা সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে যে, নিরক্ষরতা একটি সামাজিক অভিশাপ। সাক্ষরতার অভাবে সমাজ প্রগতি তার কাঙ্ক্ষিত গতি অর্জন করতে পারছে না। সামাজিক বৈষম্যের বিষয়টিও দিনে দিনে একটি বিরাট সমস্যা হিসেবে পরিগণ্য হয়ে ওঠে। এই সূত্রে এই বাংলাদেশে কয়েক দশকে মুদ্রিত ও প্রচারিত খুবই অর্থবহ এবং সোজাসাপ্টা কথাসম্বলিত অনেক পোস্টারের কথা আমাদের নিশ্চয়ই মনে পড়ে।

আশার কথা এই যে, আমাদের সমাজেও সাক্ষরতা পরিস্থিতির বেশ উন্নতি লক্ষ করা গেছে। অবশ্য এমন বিবৃতির মধ্যেও একটা গভীর দুঃখবোধ আছে। দেশের স্বাধীনতা লাভের চল্লিশ বছর পরেও নিরক্ষরতা এই সমাজের একটা বৈশিষ্ট্য হিসেবে অস্তিত্বমান, তা ভাবলে নিশ্চয়ই মাথা হেঁট হয়ে যায়। স্বাধীন জাতি হিসেবে যেখানে সকল নাগরিকের সুশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হবার কথা, তার বিপরীতে যখন আমরা সকলকে সাক্ষর করার কর্মসূচিকেই সফল করতে পারিনি, তখন দেশের অন্যান্য ক্ষেত্রের উন্নয়ন ম্লান হয়ে যায়।

সাক্ষরতা ধারণার বিষয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং কোন বয়সের জনসংখ্যাকে সাক্ষরতার বৃত্তে অন্তর্ভুক্ত করা হবে, এ বিষয়ে একটা অনিঃশেষ ও অমীমাংসিত সংকট থেকে গেছে। নিরক্ষর জনগোষ্ঠী চিহ্নিত করা ও তার সমাধানকল্পে বহুমাত্রিক লক্ষ্য নির্ধারণ অবশ্য একান্তভাবেই আমাদের দেশের কোন স্বতন্ত্র সমস্যা নয়। নানা কারণে, বিশেষত মানব সম্পদ পরিমাপের নতুন অর্থনৈতিক ধারণার সম্প্রসারণের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত বাস্তব ও যৌক্তিক কারণে সাক্ষরতার সংজ্ঞায়নে দিনে দিনে ব্যাপ্তি ঘটেছে। মৌলিক এবং সাধারণ শিক্ষার এলাকাকে এখন সাক্ষরতার সীমানার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শুধুই ন্যূনতম অক্ষরজ্ঞান, ভাষাজ্ঞান ও হিসাবের জ্ঞান দিয়ে সমাজ উন্নয়নের যেমন কোন কার্যকর ভূমিকা রাখা যায় না, তেমনি অমন সীমিত যোগ্যতা দিয়ে প্রতিনিয়ত কঠিনতর হয়ে ওঠা প্রতিযোগিতামূলক সমাজে নিজের অবস্থানকেও সুদৃঢ় করা যায় না। এই সত্যটা সব দেশের, বিশেষত উন্নয়নশীল দেশের সমাজকে স্বীকার করে নিতে হয়েছে।

২০১৪ সালের আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের প্রতিপাদ্যে দক্ষতা লাভের ওপর যে বাড়তি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, তা এই সমাজসত্যকেই জোরালোভাবে প্রতিফলিত করে। বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। এদেশের ক্রমবর্ধমান বিপুল জনসংখ্যাকে সাধারণ বিচারে গভীর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও, গবেষকরা এমন মত প্রদান করেছেন যে, এই বিশাল জনগোষ্ঠীর কর্মক্ষম মানুষকে কাজে লাগাতে পারলে তা আর সমস্যা বলে বিবেচিত হবে না। সাক্ষরতা ও দক্ষতা অর্জনের হার অবশ্যই জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারকে অতিক্রম করে যাবে, এমন সুচিন্তিত কর্মকৌশল গ্রহণ ও তার বাস্তবায়নই আমাদের জাতিকে নিরক্ষরতার লজ্জা থেকে উদ্ধার করতে পারবে। এবং এই কাজে সকলের অংশগ্রহণের বিকল্প নেই।

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক শফি আহমেদ

সম্পাদক
রাশেদা কে. চৌধূরী

গণসাক্ষরতা অভিযান ৫/১৪ হুমায়ূন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ কর্তৃক প্রকাশিত। মেসার্স তিথি প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিং, ২৮/সি-১ টয়েনবী সার্কুলার রোড, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা

সম্পাদকীয় যোগাযোগ● ফোন:৫৮১৫৩৪১৭, ৯১৩০৪২৭, ৮১৫৫০৩১-২ ফ্যাক্স: ৯১২৩৮৪২মেইল: info@campebd.org Website: www.campebd.org